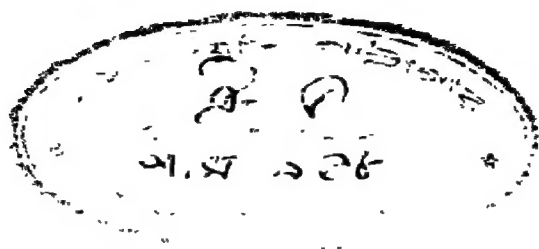


মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত



রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত

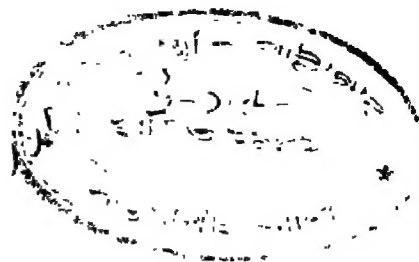
[প্রথম রাজসংস্করণ]

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বঙ্গুমতী-সাহিত্য-মন্দির ইহাতে
ত্রিশতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

মূল্য ২৮ টাকা।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
বঙ্গুমতী “বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে”
* শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত *



বিজ্ঞানোৎসাহী, সংযতমনা, উদারচরিত্র.

কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত

প্রিয় ভ্রাতঃ!

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিজ্ঞা আহরণ
করিয়া আসিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি, তখনই আনন্দিত হই।
কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য ধর্মের অধিকারী। সে ধর্ম, নিশ্চল
উদারচরিত্র, মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞানচর্চায় আনন্দনীয়
উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সদৃশ-সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধন কর,
ভ্রাতার এই মঙ্গলেক্ষা। ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শন-
স্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

দক্ষিণ শাহবাড়পুর, }
১২৮৪ বঙ্গাব্দ }

ভোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত



শ্রী ব্রজনাথ চন্দ্র দত্ত

মহারাজী জীবন-প্রভাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবন-উষা

দেও করতালি, জয় জয় বলি,

করিয়া অঞ্জলি কুশুম লহ ।

ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে

উদয় অরুণ উষার সহ ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুহম্মদ ঘোরী আগম্যাবর্ত্ত প্রদেশ জয় করেন। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসল-মানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিল, বিক্ষ্যাতল ও নশ্বদারূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিবার কোন উত্তম করে নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত নশ্বদা নদী পার হইলেন, এবং সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজপুল বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল,

এবং হিন্দুরাজ্য বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ প্রধান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া শ্রীদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। দেবগড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য দিল্লীর মুসলমান-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ টোগলক দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস করেন, এবং দেবগড়ের নাম পরিবর্তন করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন। কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। হিন্দুগণ বিজয়নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং মুসলমানগণ দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিল। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোন চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু দিল্লীর উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দুসাম্রাজ্য বিপদশ্রুত ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিল। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল; সুতরাং একে অত্রের ধ্বংসসাধন করিল। কালক্রমে দৌলতাবাদরাজ্য বর্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল ও একটির স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমানরাজ্য হইয়া উঠিল। তখন মুসলমান-রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে

তেলিকোটার মুছে বিজয়নগরের সৈন্যদিকে পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপসাধন করিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল; কণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দু-রাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খৃঃ অব্দে সম্রাট আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদনগর-রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী-সৈন্যের চতুর্গত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬০৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর-রাজ্য অধিকার করেন, সুতরাং এই আশ্বাশিকাবিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজ্যবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা দিগের ভাষা আবশ্যক। মুসলমান-রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ, মুসলমান-দিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কর্মচারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল, এবং পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্মিত ছিল। মুসলমান-মূলভানগণ সেই সকল পার্কৃত্য দুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে রাখিতে সক্ষম হইতেন।

না, এবং মহারাষ্ট্রীয় কিল্লাদারগণ প্রায়ই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে ভূগর্ভস্থ জন্তু আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন অনেক হিন্দু গঙ্গবদার রাজদরবারে নিয়োজিত থাকিতেন, তাঁহারা শত, কি দ্বিশত, কি পঞ্চশত, কি সহস্র, কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশ মতে সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। তাঁহারাও সৈন্তের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্ত এক একটি জায়গীর ভোগ করিতেন।

বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে ছাদশ সহস্র পদা-তিকের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন; সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অন্নযাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীরস্বরূপ দান করেন; এবং চন্দ্ররাওয়ের গন্তান-সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে শাসন করেন। এইরূপ রাওনায়ক নিষ্ফলকরবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে ফুলতন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে মল্লরী প্রদেশে, মুখর প্রদেশে, কাপসী ও মুধোল দেশে, বট্ট প্রদেশে ও ওয়ারি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কাৰ্য্যসাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে আপনাদিগের মধ্যেও তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জাতি-বিরোধের জ্বালা আর বিরোধ নাই, স্তত্রাং পর্ততসকুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশে সৰ্ব্বস্থানে ও সৰ্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশীয়দিগের মধ্যে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ। পরিচালনার দ্বারা আমাদের শরীর যেরূপ স্ববন্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, কার্য্য, উপদ্রব ও বিপর্য্য দ্বারা জাতীয়

বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহা-রাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহমদনগরে সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভঁস্লামা নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। শিক্কাবীরের যাদবরাওয়ের স্ত্রায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন, দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ সমুদ্ভূত। ভঁস্লামাংশ যাদবরাওয়ের স্ত্রায় উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ও ক্ষমতাশালী বংশ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভঁস্লামাংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঘুনাথজী হাবিলদার

কাকন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ ।

শ্রবণ তাহার দিব্য পঙ্কজ নয়ন ॥

শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর ।

অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর ॥

দুই দিকে দুই তুণ বামে ধরে ধনু ।

আভাষলম্বিত ভূজ অনিন্দিত তনু ॥

কালীরাম দাস ।

কঙ্কণপ্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে ;
১৬৬৩ খ্রঃ অঙ্গের বসন্তকালের একদিন সাগরকালে সেইরূপ ঘোরঘটা
দৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্য্য এখনও অস্ত বায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ
দীর্ঘবিলম্বী অতি কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত, চারিদিকে পর্কভশ্রেণী ও
অরণ্য অঙ্ককারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্কতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে,
প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই। যেন অচিরে প্রচণ্ড
বাত্যা আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে শুক হইয়া রহিয়াছে।
নিকটস্থ পর্কতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা
যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্কতগুলি গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ
করিয়াছে, আর নীচে উপত্যকা অঙ্ককারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পর্বত-প্রবাহিনী জনপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের স্রাব দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্বত-পথের উপর দিয়া একমাত্র অস্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও দম্বাক্ত। অস্বারোহীর বেশ বর্দ্ধময়, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বর্শা, কোষে অসি, বাম-হস্তে বলুগা ও বাম-বাহুতে ঢাল, পরিচ্ছদ ও উষ্ণীয় রাজস্থানদেশীয়। অস্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইবে, অবয়ব উন্নত ও গৌরবর্ণ, কিন্তু পরিশ্রম ও রৌদ্র-উত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত, ললাট উন্নত, চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ। মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লক্ষ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বলুগা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন ও হস্ত দ্বারা ললাটের ঘর্ষ মোচন করিয়া নিবিড়কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পশ্চাদিকে সরাইয়া কণ্ঠের আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরেই ভূমূল বাত্যা আসিবে, তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইতেছে এবং অনন্ত পর্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে। ছুই একটি স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে এবং যুবকের শুক ওঠে ছুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এখন যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিলম্ব সহ্য না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন, তিনি

কোন আপত্তি তুনে না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভিযোগ নাই, পুনরায় বর্ণা হস্তে লইয়া লক্ষ দিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন, আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় বেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিকর্ষি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অলক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎস্রোত চমকিত হইল। মেঘের গর্জনে সেই অনন্ত পর্বত-প্রদেশ যেন শতবার শব্দিত হইল। অচিরেই কোটি রাক্ষস-বল বিজ্ঞপ্ত করিয়া ভীষণ-গর্জনে পবন প্রবাহিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শত পর্বতের অসংখ্য পাদপশ্চেনী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উৎপত্ত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্বত-স্তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল, ও মধ্যে মধ্যে বজ্রশব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। স্বরায় যুগলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্বত, অরণ্য ও উপত্যকা স্নানিত করিল, জলপ্রপাত ও স্তরঙ্গিণী সমুদয়কে ক্ষীতকায় ও উচ্ছলিত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিবন্ধ না হইয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবে। বায়ুপীড়িত লক্ষণাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উকীষ ছিন্ন হইল, তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রক্তের পড়িতে লাগিল, তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে অপেক্ষা করা হুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা না করিয়া যতদূর সাধ্য, সতর্কভাবে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। দুই

তিন দণ্ড মৃণালধারায় বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। অন্তাচল চূড়াবলসী সূর্য্যোদ আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত নক্ষত্রসমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

সুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অগ্ৰ থামাইলেন ও সিস্ক কেশ-গুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রণস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যত দূর দেখা যায়, দুই তিন সহস্র উন্নত পর্ব্বত-শিখরগুলি শোভা পাইতেছে, ও সেই পর্ব্বতসমূহের পার্শ্বে, মস্তকে, চারিদিকে নবস্নাত, নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপত্রাণী সূর্য্যালোকে চিক্-চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জনপ্রপাত দশগুণ ক্ষীণকায় হইয়া বজ্রিত-গোরবে শূঙ্গ হইতে শূঙ্গান্তরে নত্যা করিতেছে, ও সূর্য্যের সূৰ্ব্বণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জনপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধ্বজ নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে, ও বহুদূরে বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া মেঘরাশি রষ্ট্ররূপে গলিত হইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অনলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, অমনি বান্ধনা শব্দে দুর্গবার কঙ্ক হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, অধিক সকালে পৌছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অগ্নি রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।

যুবক। সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; তবানীর প্রসাদে প্রভুর

নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অশ্বই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিল্লাদারও আপনার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদে খাইলেন, ও সম্যক্ অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশে হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউজীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা, তিনি লিপিস্তম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিল্লাদার কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন, ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপিপাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিহীন গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন। লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা যুবকের দিকে মনঃভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন,—হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নাখাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র। কিন্তু বিবেচনা করি, কার্যকালে পরাজুখ নহ।

রঘুনাথজী। যত্ন ও চেষ্টামাত্র মনুষ্যসাধ্য বোধ হয়, তাহাতে প্রভু আমার ক্রটি দেখেন নাই।। সদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।

কিল্লাদার। তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ-দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?

রঘুনাথজী । প্রভুর নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ।

কিন্নাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া দ্বিষং হস্ত করিয়া বলিলেন,—
জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্যসাধনে তোমার যেক্রম যত্ন, তোমার আকৃতি
তাহার পরিচয় দিতেছে । রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিন্ধু,
ও ললাটের দ্বিষং ক্ষত দেখা যাইতেছিল ।

পরে কিন্নাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয়,
মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিলেন । রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন, উত্তর দিলেন ।

কিন্নাদার বলিলেন,—তবে কল্যাণ প্রাপ্তি আমার নিকট আসিও,
আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে । আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম
করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কাণ্ডে
নিযুক্ত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কাণ্ডের অনুপযুক্ত নহে । এই
প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মন্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন ।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন । রঘুনাথকে একপ
পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই যে, কিন্নাদার শিবজীকে অতিশয় গুঢ়
রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গুঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতে-
ছিলেন । সেগুলি লিপির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি
শত্রুহস্তে পড়িতে পারে । রঘুনাথজীকে সেগুলি বাচনিক বলা
যাইতে পারে কি না, অর্ধবলে বা কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্তী
হইয়া গুঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না,
কিন্নাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন । রঘুনাথ নয়নপথে
বহির্ভূত হইলে পর কিন্নাদার দ্বিষং হস্ত করিয়া বলিলেন,—শিবজী এ
বিনয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কাণ্ডে যথার্থই উপযুক্ত লোক
পাঠাইয়াছেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরযুবালা

সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জন্ম হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচল বসি, আধবদনে হাসি, আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উজর হেরি, আধ আঁচর ভরি, তব ধরি দগ্ধে অনঙ্গ ॥
একে তহু গোরা কনয় কটোরা অতহু কাঁচল উপায়।
হরি হরি কহ মন, জহু বুঝি ঐছন ফাস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতাপাতি অধর মিলায়ত মুহু মুহু কহ তাহি ভাষা
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পুরাল আশা ॥
বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকটে বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরে শিবজী ভবানীর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অম্বরদেশীয় অতি উচ্চ কুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়া ছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্যে লিপ্ত হইতেন না।

রঘুনাথ যৌবনোচ্ছিত উল্লাসের সহিত আপন রুককেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত যুদ্ধস্থলে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন।

যখন মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের আকাশের স্তিমিত আলোকে শ্বেতমন্দির সুন্দর শোভা পাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র উদ্যান প্রায় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বাটাতে নাই, স্তম্ভরাং রঙ্গনাথ উদ্যানে একটি প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সেই উদ্যানে একজন বালিকা দুল তুলিতে আসিলেন। রঙ্গনাথ দেখিয়া দ্বিগুণ বিস্মিত হইলেন। কেন না, বালিকা এ দেশের নহে, পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলেন বালিকা রাজপুত্র। বহুদিন পরে একজন স্বদেশীয় রমণীকে দেখিয়া রঙ্গনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, রাজপুত্র বালিকার নিকটে যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রঙ্গনাথ সে ইচ্ছা দমন করিলেন, বৃক্ষ-তলে সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক সেই বালিকার দিকে নিরাক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, রঙ্গনাথের হৃদয় আরও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

বালিকা অমুমান ত্রয়োদশবয়সী। তাঁহার রেশমবিনিদিত সূমার্জিত অতি কৃষ্ণ কেশপাশ গণ্ডস্থলে ও পূর্দদেশে লিখিত রহিয়াছে, এবং উজ্জল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরবিনিদিত চক্ষুদ্বয় কিঞ্চৎ আগুত করিয়াছে। ক্রয়ুগল যেন তুলি দ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা বর্ধন করিতেছে। উর্দ্ধদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, হস্ত ও বাহু সূগোল, এবং সূবর্ণের বলয় কঙ্কণ দ্বারা সূশোভিত। বস্ত্রের ললাটে আকাশের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাক্ষন বর্ণকে সমাপিক উজ্জল করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদন্নত বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোহুল্যমান রহিয়াছে। রঙ্গনাথ অনিমেষলোচনে সেই সায়াংকালের

স্মিত আলোকে সেই অপূর্ণদৃষ্টা রাজপুতকন্নার দিকে চাহিয়াছিলেন ; তাঁহার হৃদয় পূর্বে অনমুভূত আনন্দশোভে সিক্ত হইতেছিল ।

কন্না ফুল তুলিয়া গৃহে যাইবার উপক্রম করিতেছেন. এমন সময়ে দেখিলেন, অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় রাজপুত যুবক তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন । ঈষৎ লজ্জায় কন্নার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন । আবার চাহিয়া দেখিলেন । যুবক তখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোণে খড়া, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বশী । যুবক অনিমেষলোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । বহুদিন পরে একজন দেশীয় যোদ্ধাকে এই মহারাষ্ট্র-দুর্গে দেখিয়া রাজপুতবালা প্রথমে বিস্মিত হইলেন, যুবকের আকৃতি ও উজ্জ্বল গৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন, যুগ্মশূল নত করিয়া ফুলের সাজি লইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্ত প্রাপ্ত হইলেন । মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ধীরে ধীরে চিস্তিতভাবে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও পুরোহিতের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এই অবসরে আমরা পাঠককে পুরোহিতের পরিচয় দিব ।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ । তাঁহার নাম জনার্দন দেব । তিনি অম্বরের প্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহের একজন সভাসদ ছিলেন, পরে শিবজীর বহু অমুরোধে, জয়সিংহের অহুমত্যস্থগারে শিবজীর সর্বপ্রথম বিজিত ভোরণদুর্গে আগমন করেন । তাঁহার পুত্রকন্না কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশত্যাগের অচিরকাল পূর্বেই তিনি এক কত্রিয়কন্নার লালনপালনের ভার লইয়া ছিলেন । কন্নার পিতা জনার্দনের আঠৈশব পরমবন্ধু ছিলেন, কন্নার

মাতাও জনার্দনের জীকে ভগিনী সন্মোহন করিতেন। কত্নার পিতা-মাতার কাল হওয়ায় নিঃসন্তান জনার্দন ও তাঁহার গৃহিনী ঐ শিশু ক্ষত্রিয়বংশের লালন-পালনভার লইলেন, ও তোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অপত্যনির্কিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনার্দনের জীবন কাল হইলে কত্না সরসু ভিন্ন বুদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না, সরসুবালাও জনার্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভালবাসিতেন। কালক্রমে সরসুবালা নিক্রপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ লাক্ষণ জনার্দনকে বধ মুনি ও তাঁহার পালিতা নিক্রপমা লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনার্দনও কত্নার মৌদন্যো ও স্নেহে পরিভূষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্কাসনের দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রত্ননাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এখনও বলিষ্ঠ, চক্ষুর শান্তিরসপূর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। জনার্দনের বর্ণ গৌর এবং স্বক হইতে যজ্ঞোপবীত লব্ধিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র মন ও সরল হৃদয় তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দন দীর্ঘে দীর্ঘে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রত্ননাথ সমস্তমে আসনত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দন শিবজীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্ননাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—প্রভুর প্রার্থনা যে, তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত রণে নিমুক্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার জয়ের

অন্ত ভবানীর নিকটে পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মহুয্যচেষ্ঠা বুধা।

জনার্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই বর্ষের গ্রহরিত্তরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও, সে বিষয়ে ক্রটি করিব না।

রঘুনাথ। দেবীপদে প্রভুর আর একটি আবেদন আছে। তিনি ধোরতর বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কণক্ষিৎ পূর্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

জনার্দন কণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্যাণে উত্তর জানিতে পারিবে।

রঘুনাথ ধনুবাদ দিয়া বিদায় হইবার উদ্ভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনার্দন বলিলেন,—তোমাকে ইতিপূর্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অস্ত্র কি এই প্রথম এ স্থলে আসিয়াছে?

রঘুনাথ। অস্ত্রই আসিয়াছি।

জনার্দন। দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থান আছে?

রঘুনাথ। পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্যাণে ইহা চলিয়া যাইব।

জনার্দন। কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?

রঘুনাথ। প্রভুর অমুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদিগকে সর্বদাই এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।

জনার্দন। বৎস! যুদ্ধ সময়ে কেশ অনিবারণ্য, কিন্তু অল্প কেশ-সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিতকত্তা তোমার খাণ্ডের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া কল্য শিবজীর নিকটে দেবীর আজ্ঞা লইয়া যাইবে।

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা শ্লীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এ যাতনা, না আনন্দের উদ্দেশ্য? জনার্দনের পালিতকত্তা কে? তিনি কি সেই পুষ্পোচ্ছানে দৃষ্টা লাবণ্যময়ী রাজপুতবাল্য?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কণ্ঠমালা

মজ্জের সাধন কিংবা শরীর পত্তন ।

ভারতচন্দ্র রায় ।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযুবালা পিতার আদেশে অতিথির খাজের আয়োজন করিয়া দিলেন । রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন । মহারাষ্ট্রদেশে অস্তাবধি আহুত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে ।

রঘুনাথ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয় আজি চাক্ষু্য-পরিপূর্ণ ও অস্থির । সরযু যত্ন করিয়া অনেক প্রকার আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ অণু কি খাইলেন, ঠিক জানেন না । অনার্দন ওৎপ্লব-সহকারে রাজস্থানের কথা কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ সময়ে সময়ে উত্তর দেন, সময়ে সময়ে একটু অনমনস্ক হইলেন ।

আহার শেষ হইল । খেতপ্রস্তুতবিনির্মিত আধারে সরযু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্ৰধারিণীর দিকে সোহাগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয় সে দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া সেই কন্ঠার দিকে ধাবমান হইল । চাবি চক্ষুর মিলন হইল, সরযুর মুখমণ্ডল লজ্জায় লবঙ্গ রক্তবর্ণ হইল, মুখ অবনত করিয়া সরযু ধীরে ধীরে

সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য সরষু জল আনিয়া দিলেন। রঘুনাথ বক্সর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রহিলেন, কেবল সরষুর স্নন্দর সুবর্ণবলয়-বিজড়িত হস্ত ও কঙ্কণ-বিজড়িত শৃঙ্গোল বাহুযাত্র দেখিতে পাইলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রঘুনাথের শয্যাচরনা হইল। রঘুনাথ শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার দ্বারে দ্বারে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে সেই পুষ্পোচ্চানে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্রবিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অন্নবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুনিষ্ক ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে। হুর্গে শক্যাত্মক নাই, কেবল মধ্য মধ্য প্রহরিগণের শক্যাত্মক শুনা যাইতেছে, ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিশ্চক্ৰ ছুর্গে ও চতুর্দিকস্থ পর্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথ অস্ত্র কেন সেই উচ্চানে পদচারণ করিতেছেন, তাহা রঘুনাথ জানেন না। এতদিন রঘুনাথ বাসক ছিলেন, অস্ত্র যেন সহসা তাঁহার শাস্ত্র, নীল জীবনাকাশের উপর একটি নূতন আলোক উদ্ভিত হইল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা ও বেগবতী মনের বৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শতবার সেই রাজপুত্রবালার আনন্দময়ী মূর্তি তাঁহার মনে আসিতে লাগিল, সেই আলোচ্যলিখিত ক্রবুগল, সেই পুষ্পবিনিমিত্ত মধুময় ওষ্ঠ, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই শৃঙ্গোল বাহুবুগল, সেই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, সেই চিন্তহারী অভুল লাবণ্য। রঘুনাথ। এ স্নন্দরী কি তোমার

হইবে? তুমি এক জন সামান্ত হাবিলদার মাত্র, জনার্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত্র, তাঁহার পালিতকন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়। কি জন্ত এরূপ আশার হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেককণ কি চিন্তা করিতে-ছিলেন। অনেককণ পর দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন,—

“ভগবন, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য হইব। বশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কি জন্ত আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অস্ত্র অপেক্ষা ক্রীণ? বাহু কি অস্ত্র অপেক্ষা দুর্বল? দেবগণ আমার সহায় হও, আমি যুদ্ধে পিতার নাম রক্ষা করিব, রাজপুত্রের উচিত সম্মান লাভ করিব, তাহার পর? যদি কৃতকার্য হই, তাহা হইলে সরযু! আমি তোমার অযোগ্য হইব না। তখন সরযু! তোমাকে গল্পচ্ছলে অস্ত্রকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার স্নন্দর হস্তদ্বয় আমার এই কম্পিত হস্তদ্বয়ে স্থাপন করিব, তখন ঐ লাবণ্যময়ী দেহলতা এই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ধারণ করিব, তখন ঐ স্নন্দর বিষ-বিনিমিত ওষ্ঠদ্বয়”—
রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্নত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে গৃহের দিকে ফিরিলেন। সহসা দেখিলেন, একটি কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে,—ছুইটি করিয়া মুক্তা, পরে একটি করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্বেদিন সন্ধ্যাকালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, অসাধনতা বশতঃ ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ আকাশের

দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ভগবন্! এ কি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ দান করিলেন?

মালাটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রঘুনাথ নিজা গেলেন। পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিজাভক্ত হইল। জনার্দনদেবের নিকট ভবানীর আশ্রা জানিলেন,—“শ্বেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বর্গ্যদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।”

হৃগত্যাগের পূর্বে রঘুনাথ একবার সরযুর সহিত দেখা করিলেন। সরযু যখন পুনরায় উদ্ভানে কুল তুলিতে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথও তথায় যাইলেন। হৃদয়ের উদ্বোধন কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—ভজ্ঞে! কল্যাণ নিশিযোগে এই কণ্ঠ-মালাটি এই স্থানে পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসিয়াছি, অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন।

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট, সেই উজ্জল নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধা! রমণীর গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—যদি অজ্ঞমতি করেন, তবে এই হৃদয় মালাটি উহার অভ্যন্তর স্থানে পরাইয়া দি। এই অমুগ্রহটি আমাকে প্রদান করুন, ভগবান্ আপনাকে স্মৃতে রাখিবেন।

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় কম্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্মতি লক্ষণ পাইয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্ডার পবিত্র নরীর স্পর্শ করিলেন না।

কণেক পরে রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে অতিথিকে বিদায় দিন।

সরযু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংবন করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নমন কিরাইয়া অতি মৃদু অশ্রুপট্টবরে কহিলেন,—আপনার নিকট অল্পগৃহীত রহিলাম, পুনরায় যদি হুর্গে আইসেন, ভরসা করি, পুনরায় পিতার এই মন্দিরে অবস্থান করিবেন।

শিপাগার্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর স্রাব, পঞ্চভ্রাতৃ পঞ্চকের পক্ষে উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটার স্রাব, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল। তিনি উত্তর করিলেন,—ভদ্রে, আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না, জানি না। কিন্তু ষত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবনির্মিত মূর্তি মূহুর্তের অস্ত্রও বিন্ধিত হইব না।

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন, সেই আশ্রিত নয়ন দুইটি হলু হলু করিতেছে, তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সায়ের্ত্তা খাঁ

কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ।

নবানচন্দ্র সেন ।

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খৃঃ অব্দের পূর্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন বন্দ করেন নাই। সেই বৎসর সায়ের্ত্তা খাঁ আমীর উল উমরা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। সায়ের্ত্তা খাঁ সেই বৎসরেই পূনা, চাকনদুর্গ ও অন্ত কয়েক স্থান অধিকার করেন। পরবৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে সায়ের্ত্তা খাঁ শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা বশোবন্তসিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খৃঃ) বহু সৈন্য লইয়া সায়ের্ত্তা খাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্ত পূনা নগরের নিকটে শিবির সম্মিলিত করিয়াছিল ও সায়ের্ত্তা খাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাণ্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সায়ের্ত্তা খাঁ শিবজীর চাতুরী বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অহমতিপত্র বিনা

কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী নিকটবর্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায় অধিক পরিপক্ব হয় নাই, দিল্লীর শিক্ত সেনার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, সুতরাং শিবজী কৌশল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্যবিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষভাগে এক দিন সায়াংকালে পরাক্রান্ত মোগল-সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন। কিরূপে শিবজীকে পরাজয় করিবেন, তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জল দীপাবলী জলিতেছে। আনন্দের ভিতর দিয়া সায়াংকালে শীতল বায়ু উদ্ভানের গুপ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা বাইতেছে।

আনওয়ারী নামে সায়েস্তা খাঁর এক জন চাটুকার বলিল,—আমীরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা বাত্যার সম্মুখে শুক পত্রের ছায়া আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।

চাঁদ খাঁ নামক এক জন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল-বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি বোধ করি, তাহাদের ঐ দুইটি কমতাই আছে।

সায়ের্তা খাঁ। কেন ?

চাঁদ খাঁ। গতবৎসর কতিপয় পার্শ্বীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন-দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি

চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছে, তাহা জহাঁপনার স্মরণ আছে। একটি দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক যোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্বস্থানে আমাদের সৈন্ত থাকিতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ পর্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।

সায়েন্তা খাঁ। চাঁদ খাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন? পূর্বে তাহার একরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরস্তর রহিলেন।

আনুওরী। জহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুর-বিশেষ, তাহারা যে পর্বত-ইন্দুরের ভাষা গঠে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করি না।

চাঁদ খাঁ। পর্বত-ইন্দুর পুনর ভিতর গর্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়েন্তা খাঁ। এখানে দিল্লীর সস্র সহস্র নখাঘুণ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ সকলেই "কেরামৎ কেরামৎ" বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে বৃদ্ধ হইবে, তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন-দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি সায়েন্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য সিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

চাঁদ খাঁ। জহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রদিগের বল, উহারা সন্মুখ-রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেন না, দেশ পর্ত্তময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া অস্ত্র স্থানে উপস্থিত হইবে, আরম্মা তাহার উদ্দেশ পাঁইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রদিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সায়েন্তা খাঁ। কেন? মহারাষ্ট্রিয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাচ্ছাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাচ্ছাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদ খাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই যোগলদের জয়, ধরিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু এই পর্ত্ত-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাচ্ছাবন করিয়া ধরিতে পারে, এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ণাবৃত্ত ও বহু অস্ত্রসম্বিত, সমভূমিতে, সন্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ চুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্ত্ত-প্রদেশে তাহাদিগের বাতাস্রাতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের জায় তুঙ্গশৃঙ্গে লক্ষ দিয়া উঠে ও হরিণের জায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জহাঁপনা, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন, সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রদিগের অস্ত্র অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের পশ্চাচ্ছাবনের চেষ্টা

করিলেই বা কি হইবে? দেখুন, নিতাইজী অনায়াসে আমদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, ক্রমশঃ জয়ান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?

গায়ের্তা খাঁ সক্রোধে বলিলেন,—ক্রমশঃ জয়ান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদ খাঁ, তুমিও সমুখ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীখানের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই?

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—পরামর্শ দিতে পারি একরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেকরূপ হুকুম হইবে, তামিল করিতে এ দাশ পরাজুখ হইবে না।

এই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী জায়শাজী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। গায়ের্তা খাঁ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

কণেক পর মহাদেওজী জায়শাজী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। জায়শাজীর বয়স এখনও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের জায় ঈষৎ খর্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নমন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলকচন্দন, স্বক্কে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তুলার কুর্তিতে আবৃত, স্নাতবাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে

না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীব, একপ প্রকাণ্ড যে বদন-মণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়ের্তা ঝাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়ের্তা ঝাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিংহগড়ের সংবাদ কি ?

মহাদেওজী একটি সংক্ৰত শ্লোক বলিলেন,—

সস্তি নস্তো দণ্ডকেয়ু তথা পঞ্চবটীবনে।

সরযু-বিচ্ছেদশোকং রাঘবস্ত কথং মহেৎ ॥

অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযু নদীর বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলিতে পারেন ? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ একগুণ্ড শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সম্ভাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন ?

সায়ের্তা ঝাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রধান দুর্গ হস্তগত করিয়াছি, একগুণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এখনও আশা আছে।

ব্রাহ্মণ দৈয়দ্ব্যস্ত করিয়া পুনরায় একটি সংক্ৰত শ্লোক বলিলেন,—

ন শক্তো হি স্বাভিলাষঃ জাতয়িতুঞ্চাতকঃ।

জাত্বা তু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকম্ ॥

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ যেমতে জানাইতে পারে না, কিন্তু যেম সেই অভিলাষ বুঝিয়া আপনার দয়াবশতঃই তাহা পূর্ণ করে। মহাজ্ঞানের যাচককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী একগুণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার অভিলাষ জানিয়া অমুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন, তাহাই শিরোধার্য।

সায়েন্তা থা। আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—
পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিভুষ্ট হইলাম,
বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরি-
পূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন?

মহাদেওজী বলিলেন,—

কেশরিণঃ প্রতাপেন ভয়বিদগ্ধচেতসঃ ।

ত্রাহি দেব ত্রাহি রাজন্ ইতি ব্রুবন্তি ভূচরাঃ ॥

অর্থাৎ দিল্লীশ্বরের সৈন্তের দৌর্দণ্ড-প্রতাপে বিপর্যাস্ত ও ব্যতিব্যস্ত
হইয়া আমরা কেবল ত্রাহি ত্রাহি এই শব্দ করিতেছি।

সায়েন্তা থা। এবার আহ্লাদ সম্বরণ করিতে পারিলেন না,
বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম,
এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন, তবে শিবজী
আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র
বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সায়েন্তা থা সেইটি দেখিলেন।
পরে বলিলেন,—হ্যা, আমি নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে
কি কি প্রস্তাব করিবার আছে বলুন।

মহাদেওজী। প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে, যখন প্রথমেই
আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা রুখা।

সায়েন্তা থা। ভাল।

মহাদেওজী। সুতরাং সন্ধির জন্ত তিনি উৎসুক হইয়াছেন।

সায়েন্তা থা। ভাল।

মহাদেওজী। এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত

হইবেন, তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্ববান হইবেন।

সায়েন্তা থা। প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?

মহাদেওজী। তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই। মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।

সায়েন্তা থা। ভাল, প্রথম কথা আমি বলিরাছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।

মহাদেওজী। সে কোন্ কোন্টি?

সায়েন্তা থা। তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন, তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার অস্ত্র কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত, তাহা যেন আমি দুই চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি।

মহাদেওজী। যেরূপ আদেশ করিলেন, সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, তখন যত দিন সন্ধিস্থাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

সায়েন্তা থা। কদাচ নহে। দ্বর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমনত দ্বর্ত্ততা নাই যে, তাহাদিগের অসাধ্য।

যত দিন সন্ধি একবারে স্থাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদিগের অনিষ্ট করিও।

“এবমন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। এক জন যোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ভিজ্জাঙ্গা করিল,—দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন?

দূত উত্তর করিলেন,—এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহাই দেখিতেছি। এটিও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয়, একে একে এই সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে। হা! ভগবান্।

প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল,—সে জন্ত আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহু জনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শুভকার্যের পুরোহিত

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিণী ।

নবীনচন্দ্র সেন ।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনরায় বহু পথ অতিবাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন । দুই একটি দোকানে জব্যাক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন । প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নিৰ্ক্ষাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত ।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন । আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ । ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল, যেন পশ্চাতে তিনি পদশব্দ শুনিতে পাইলেন । স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে পাইলেন না ।

পুনরায় পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল, যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে । ব্রাহ্মণের হৃদয়

দৈর্ঘ্য চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ? শত্রু না গিষ্ঠ ? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে ? উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে নিঃশব্দে ভালা-নির্ম্মিত কুণ্ডির আশ্রিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কৈ কেহই নাই, সকলে শূন্য, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ !

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে দিগিয়া গেলেন। তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় বিস্তর লোক এখনও ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। শানার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে প্রত্যবেশে অত্যাশ্চর্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ স্থায় রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ; শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা একটি চীৎকার শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর 'ওম' দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও বে গলিতে লুকাইয়া ছিলেন, সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল, মহাদেওজী যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে চাহিল।

মহাদেওজীর হৃদয় দ্রুত দ্রুত করিতে লাগিল, তিনি খাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রচুরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন, পরে নিকটবর্তী একটি দ্বারে আশ্রয় করিলেন, সন্ধ্যাতা খাঁর এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুই জনে অতি সন্তোষে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত ?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি-পত্র পাইয়াছে ?

সেনা। পাইরাছি।

আবার সম্প্রদেয় পদক্ষেপ প্রভ হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সন্মুখে যাইয়া দেখিলেন, অন্ধকারে অনেক কণ অশ্রুত করিলেন, কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন,—রক্তহস্তে আসিয়াছ ?

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ওগো, সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে ?

সেনা। কল্য।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি পাইয়াছে ?

সেনা। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। কত জন লোকের ?

সেনা। বাগ্গকর দশ জন ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অধুমতি পাইলাম না।

ব্রাহ্মণ। এই ষথেষ্ট, কোন্ সময়ে ?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই দিক হইতে বরষাতা আরম্ভ হইবে ;

সেনা। অরুণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাগ্গকরেরা সজোরে বাগ্গ করিবে।

সেনা। অরুণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জ্ঞাতি-কুটুম্ব যত পারিবে, জড় করিবে।

সেনা। অরুণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অন্ন হস্ত করিয়া বলিলেন,—আমি সেই শুভকার্য্যের পুরোহিত ! সে শুভকার্য্যের ঘটী সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।

সহসা সজোরে নিক্শিপ্ত একটি তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুন্তির নীচে লৌহ-বর্শে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল।

তৎপরেই একটি বর্শা। বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দ্বর্ভেষ্ট বর্শা ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিকোষিত অসিহস্তে এক জন দীর্ঘ মোগল বোদ্ধা,—তিনি চাঁদ খাঁ !

অস্ত্র সভাতে সেনাপতি সায়েরজা খাঁ চাঁদ খাঁকে তীক্ষ্ণ বলিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্যবসায়ের চাঁদ খাঁর কেশ তরু হইয়াছিল, এ অপবাদ কেহ তাঁহাকে কখনও দেয় নাই। মনে মর্শাস্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অস্ত্রকে তাহা কি-জানাইবেন, মনে মনে স্থির করিলেন, কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই বুড়েই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক ছুর্গ, তাঁহার অপূর্ব ও দ্রুতগামী অসারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্যস্থাপনে অভিলাষ, হিন্দুস্বাধীনতাস্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদ খাঁর অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি বাচক্ষ্য করিবেন, এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শনপত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার শুণ্ড অতিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদ খাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয়, তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা সায়েস্তা খাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার শুনিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্তও ব্রাহ্মণ চাঁদ খাঁর নয়ন-বহির্ভূত হইতে পারেন নাই। সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয়, তাহা শুনিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তিলাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—সায়েস্তা খাঁ! বৃদ্ধব্যবসায়ের বুধা এ কেশ গুরু করি নাই, আমি তীক্ষ্ণও নছি, দিল্লীময়ের বিরুদ্ধাচারীও নছি; অস্ত্র যে বড়যন্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয়, এ প্রাচীন দাসের কথা তুমি অবহেলা করিবে না। কিন্তু আশা যায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদ খাঁ ভীর ও বর্শা ব্যর্থ

দেবিয়া লক্ষ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও বজ্র দ্বারা সজ্ঞাবে আঘাত করিলেন। বজ্র বর্ষে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

“কুক্ষেণ আমার অঙ্গুসরণ করিয়াছিল,” এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া ভীকু ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদ খাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদ খাঁর মৃতদেহ ধরাভলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ স্কন্ধ অধরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনঃপুনঃ লুকাইয়া বলিলেন,—সাম্রাজ্যে যাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করাব এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্যাণ ফলিবে।

যোদ্ধার কর্তব্যকার্য্যে যে সময় চাঁদ খাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি সাম্রাজ্যে যাঁ সে সময় বড় সুখে নিজা যাইতেছিলেন শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল,—প্রভু, কি করিলেন? কল্যাণ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় স্কন্ধ রূধা হইবে।

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি, চাঁদ খাঁ অস্ত্র সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েক দিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, অপর স্বরণ রাখিও, কল্যাণ রজনী একপ্রহর কালে।

সেনা। রজনী একপ্রহর কালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি সাম্রাজ্যে যাঁর আশ্রিত অমৃতপিত্ত দেখাইয়া নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা যশোবন্ত সিংহ

কোন ধর্মমতে কহ দাসে তুনি,
জাতিত ভাতৃজ জাতি—এ সকলে দিলা
জনাঙ্কলি ? শাজে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা ।

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত্র রাজা যশোবন্তসিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন। হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে কেবল একটিমাত্র দীপ জলিতেছে, শিবিরে অন্ধ লোকমাত্র নাই। সংবাদ আসিল, মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী শ্রায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

কণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুত্রের দিকে নুতীক দৃষ্টি করিতেছিলেন। পরে

যশোবন্ত বলিলেন,—আমি আপনার প্রভুর পত্র পাঠাইছি। তাহাতে যাচা লিখিত আছে, অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে ?

মহাদেও। প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, দেখা করিতে পাঠাইয়াছেন।

যশোবন্ত। কেবল পুনা ও চাকন-দুর্গ আমাদিগের হস্তেই আছে মাত্র, এই অন্ত খেদ ?

মহাদেও। দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার সমস্ত দুর্গ আছে।

যশোবন্ত। মোগল-মুন্সফরপ বিপদে পড়িয়া তিনি কোন কঠিনে গেলেন ?

মহাদেও। বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁহার অভ্যাস নাই।

যশোবন্ত। তবে কি অন্ত খেদ করিতে গেলেন ?

মহাদেও। যিনি হিন্দুরাজতিলক, যিনি অমরকুলানন্দ, যিনি সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা, তাঁহাকে অজ্ঞেয়তার দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল বিষম আরক্ত হইল। মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—উনদশশতাব্দীর মধ্যে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মণ্ডওয়ারের রাজত্বও তাহার হস্তেই উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাহার স্তম্ভাধিঃ-পতিপূজা বহিরাছে, সিপ্রাভীরে যাহার বাহুবিক্রম দেখিয়া অসংখ্যের ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাকে সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে যাহার জয়ের অন্ত হিন্দুনাতেই, লাক্ষণমাতেই অগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অজ্ঞ তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্য! আমি শাস্ত্র দ্রুতমাত্র, আমি কি বলিতেছি, জানি না, অপরাধ হইলে মার্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা

কেন? এ সৈন্তসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্ত উদ্ভটী
হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্ত? হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন
করিবার জন্ত? ক্ষত্রিয়োচিত যশোলাভের জন্ত? আপনি ক্ষত্রকুলধৰ্ত্ত !
আপনি বিবেচনা করুন, আমি জানি না।

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন,
—আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রের রাজপুত-পুত্র, পিতাপুত্রে যুদ্ধ সন্তবে
না, স্বয়ং ভদ্রানী এ বুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আত্মা করুন,
আমরা পালন করিব; রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র
গৌরব, রাজপুতের যশোগীত আমাদের রমনীগণ এখনও গাইয়া
থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত
হয়। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদের বজ্রা রঞ্জিত
হইবার পূর্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা
যেন বর্শা ও বজ্র ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি।

যশোবন্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—দূতপ্রধান!
তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীরেব অধীন, মহারাষ্ট্রের
সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব।

মহাদেও। এবং শত শত স্বর্ণআঁকে নাশ করিবেন, কিন্তু হিন্দুর
মস্তকচ্ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বসন্ত ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের
শোণিতশ্রোতে ক্ষত্রিয়-শোণিতশ্রোত মিশাইবে, শেষে য়েচ্ছ সম্রাটের
সম্পূর্ণ জয় হইবে।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সংবরণ করিয়া কিঞ্চিৎ
কর্কশভাবে বলিলেন,—কেবল দিল্লীরেব জয়ের জন্ত যুদ্ধ নহে, আমি
তোমার প্রভুর গহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী নিদ্রোহাচারী,
চতুর শিবজী অস্ত্রকার অস্ত্রকার অনায়াসে কল্যাণভঙ্গ করে।

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—
মহারাজ ! শাবধান, অলীক নিন্দা আপনাকে সাজে না । শিবজী কবে
হিন্দুর নিকট যে বাক্যদান করিয়াছেন, তাহার অন্তথা করিয়াছেন ?
কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন ? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত
দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্যপালন করিতে, ব্রাহ্মণকে
আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে দেব-
দেবীর পূজা দিতে কবে পরাজুগ ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ !
জৈতা ও বিজৈতাদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা ? বজ্রনখ যখন
সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে ; নৃত বলিয়া
তাহাকে পরিত্যাগ করিলামাত্র জর্জরিত শরীর নাগরাজ সমস্ত পাইয়া
দংশন করে । এটি বিদ্রোহাচরণ না স্বভাবের রীতি ? কুক্কুর যখন
খরগমকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগম প্রাণরক্ষার জন্য কাত খড়
করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্য দিকে যায় ।
এটি চাতুরী না স্বভাবের রীতি ? যাবতীয় জীব-জন্তুকে জগদীশ্বর যে
প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি তিনি সে উপায়
শিখান নাই ? আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধী-
নতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, ক্ষদ্রের
শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব ও বর্ষ বিনাশ করিতেছে, তাহা-
দিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ ? তাহাদিগের
নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে
পারি, স্বধর্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি
চতুরতা ? সে উপায় কি নিন্দনীয় ? জীবনরক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের
শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহাবককে

অন্তদিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে, সেটি কি নিন্দনীয় ? ক্ষত্রিয়রাজ ! দিনে দিনে মুসলমানদিগের নিকট মহারাজ্জীবন চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর ! আপনি হিন্দু-জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, নিবজ্জীকে নিন্দা করিবেন না ।—মহাদেওজীর অলঙ্ঘন নয়নদয় জলে প্রাবিত হইল ।

ব্রাহ্মণের চক্ষে ভাল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন— বলিলেন,—দূতপ্রবর ! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অত্ৰায় বলিয়া থাকি, যাজ্ঞনা করিবেন । আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সন্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানেন না । মহারাজ্জীবনেরা কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না ?

মহাদেও । মহারাজ ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা নরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ণ রণশিক্ষা আছে, মহারাজ্জীবনদিগের ইচ্ছার কোন্টি আছে ? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা । আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীতাস্তসারে স্বেচ্ছা দেন, পুরাতন দুর্ধ্ব তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্যক রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা পলায়ন করে । আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব ? পূর্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে, তাহারা কখনও রণ দেখে নাই । যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানভূমি চাইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য রণ-অর্থ ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা

সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদলী সেনা নাই, সেকপ অব-গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই। ত্বরিতগতি ও পৰ্ব্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবনপ্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন, মহারাষ্ট্রীয়জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুত্রের অসাধারণ গুণ অঙ্কুরণ করিবে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন, তাঁহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিম্নলিখিত হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্নিহিত করিতেছেন কেন? হিন্দুশ্রেষ্ঠের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীর ইচ্ছা ভিন্ন অগ্র ইচ্ছা নাই। মুসলমান-শাসন প্রসঙ্গের, হিন্দুজাতির গৌরব-সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দু-শাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অগ্র উদ্দেশ্য নাই। এ বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাচাযা করিতে বিমুখ হন, তবে স্বহস্তে এই কার্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন, দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উন্মোচিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপদ্রুত। শিবজী সম্রাটচিহ্নে

আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংসাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,— মাড়ওয়ার ও মহারাত্রী অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারেন না।

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত গুল থাকিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দিন। নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী কল্লিঙ্গ-রাজার অধীনে কার্য্য করিবে, কিন্তু কদাচ কল্লিঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদকালে অংকুজীবেব সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে, এমন আশ্রয় নাই।

মহাদেও। কোন কলিঙ্গ সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীও মনস্কায়ানা পূর্ণ হইবে, শিবজী সান্নিধ্যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যশোবন্ত। সেইরূপ সেনাপতিও নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কাৰ্য্যসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশেষে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। কল্লিঙ্গরাজ! কলিঙ্গযোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে একরূপ হিন্দু নাই, আকাশে একরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্ত আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীস্থর

আমাকে স্নেহ করিয়া এই কাণ্ডে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অগ্ররূপ আচরণ করিব ? সে কি ভ্রোচিৎ ?

মহাদেও । দিল্লীস্থ যে হিন্দুগণকে কাফের বলিয়া ভিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কাণ্ড কি ভ্রোচিৎ ? দেশে দেশে যে হিন্দু-মন্দির, হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভ্রোচিৎ ? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, সে কি ভ্রোচিৎ ?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন,—দ্বিজবর ! আর বলিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে ! অস্তাবদি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র ! অস্তাবদি শিবজী পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীস্থরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন, সে মহাত্মা কোথায় ? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উল্লীষের নীচে যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তুলার কুস্তির নাচে লৌহ-বস্ম প্রকাশিত হইল ! মহারাজীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন,—“রাজন ! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এঁ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাজীয় ক্ষত্রিয়, নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী !”

রাজা যশোবন্তসিংহ নিশ্চয় ও হর্ষোৎফুল্ললোচনে সেই প্যাতনামা মহারাজীযোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীস্থরের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ, শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কণেক পরে গাত্রোথান করিয়া সানন্দে ও সজলনয়নে সেই পরম শত্রুকে

আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সন্মান ও প্রণয়ের সহিত খ্যাতনামা রাজপুত-বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিলাস লইবার সময়ে কহিলেন, মহারাজ, অমুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।

যশোবন্ত। কেন, কল্য তুমি পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?

মহারাষ্ট্রীয় বীর চাতুর্য করিয়া বলিলেন,—না, একটি বিবাহকার্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহকার্যের মজাদি ত্রায়শাস্ত্রী মহাশয়ের একগণে অরণ আছে কি?

শিবজী। আছে বৈ কি! আমার শাস্ত্রবিজ্ঞা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সায়েস্তা পাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্য তিনি অজ্ঞরূপ বিজ্ঞা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পবে বিদায়ের সময় বলিলেন,— তবে দৃঢ় বিনয়ে নেকরূপ কথোপকথন হইল, সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

শিবজী। সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্ত প্রভু শিবজীকে বলিব।

যশোবন্ত। হাঁ, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্তসিংহ শিবিরাত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিবজী

অম্বর-উজ্জ্বল গ্রাসি পুষ্ট কলবন ?
অম্বর-পদাঙ্করত্নঃ শোভিত মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমর-বীৰ্য্য সময়ের খোঁজে,
ভাসিব অনন্তকাল নৈত্যের সংগ্রামে,
দেবপুত্র বত দিন না হবে নিঃশেষ ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পূর্বদিকে রক্তিমচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড়ে প্রবেশ করিলেন । উষ্ণীশ ও হুলাস কৃষ্টি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের জ্যোতিঃশিরাঃপ্রাণ ও শরীরের বর্ষ্য বাক্যক্ করিয়া উঠিল । বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে “ভবানী” নামক প্রসিদ্ধ খড়্গা । বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর চমৎকার বটে, কিন্তু সুবদ্ব, সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেটীগুলি বর্ষ্যের নীচে হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,— পেশোয়া মূরখের জিন্দল সানন্দে তাঁহাকে আলোচন করিয়া বলিলেন,— ভবানীর জয় হউক ! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন ।

শিবজী । আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ নিপদ্ হইতে উদ্ধার না পাইয়াছি ?

মুরেশ্বর । সমস্ত স্থির হইয়াছে ?

শিবজী । সমস্ত ।

মুরেশ্বর । অস্ত্র রাত্রে বিবাহ ?

শিবজী । শূন্যই ।

মুরেশ্বর । সায়েস্তা থা কিছু জানেন না ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদ থা কিছু জানেন না ?

শিবজী । সায়েস্তা থা ভীত শিবজীর নিকট হইতে সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন ; যোদ্ধা চাঁদ থা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, তিনি আর বুদ্ধ করিবেন না ।

মুরেশ্বর । রাজা যশোবন্ত ?

শিবজী । আপনি পত্রে যে সমস্ত বৃত্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল । আমি যাইয়াই দেখিলাম, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, স্তম্ভরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল ।

মুরেশ্বর । ভবানীর জয় হউক ! আপনি এক রাত্রে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন, তাহা সহস্রের অসাধ্য ! যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাবিলে এখনও ভয়ঙ্কর হয় । প্রভো, এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাজের কি থাকিবে ?

শিবজী । মুরেশ্বর ! বিপদ ভয় করিলে অস্ত্রাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদ ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে ? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকি ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন, যেন মহারাজ্জীবন স্বাধীন হয় ।

মুরেশ্বর । বীরশ্রেষ্ঠ ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী

সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছয়বেশে ?

শিবজী। এ ত শিবজীর অভ্যন্ত কার্য। কিন্তু অশ্রু সত্যই যথ্য একটি মহা বিপদে পতিত হইয়াছিল।

মুরেশ্বর। কি ?

শিবজী। এমন মুর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন ? যে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে শ্লোক অরণ্য রাগিলে ?

মুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল ?

শিবজী। আর কিছু নহে, সায়েস্তা তাঁর সভায় যাইয়া জায়শাজী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুরেশ্বর। তার পর ?

শিবজী। দুই একটি মনে ছিল, তদ্বারাই কার্যসিদ্ধি হইল।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয় ; এই স্থলে তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত লম্বে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল ; তাঁহার পিতার নাম শাহজী ; পিতামহের নাম মল্লজী। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুলতন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি ; সেই বংশের যোগপাল রাওনায়েকের ভগ্নী দীপাবতীকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নানক এক জন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অমুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে

দীপাবাক্সের গর্ভে একটি সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

সে সময়ে যাদবরাও নামক আহম্মদনগরে প্রসিদ্ধনামা এক জন সেনাপতি ছিলেন ; তিনি দশ সহস্র অশ্বরোহীর নেতা এবং প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে হিন্দুর দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদবরাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজার বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদবরাওয়ের কত্তা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, স্ত্রতরাং বালক-বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদর্শনে যাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন,—“দেমন, তুই এই বালকটিকে বিবাহ করিবি?” পরে অত্যন্ত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“তুই জনে কি সুন্দর বোড় মিলিয়াছে!” এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল ; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—“বন্ধুগণ! সাক্ষাৎ থাকিও, যাদবরাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।” সকলে এই প্রস্তাবে সন্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপনার কত্তার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই, কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদবরাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, স্ত্রতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদবরাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্যাদায় অধিক অভিমানিনী। কথিত আছে যে, যাদবরাও রহস্ত করিয়া আপন কুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ ক্রোধ

চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। মল্লজী সরোবে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছেন,—মল্লজী ! তোমার বংশে এক জন রাজা হইবেন, তিনি শত্রুর আয় শুণাশ্রিত হইবেন, মহারাষ্ট্র দেশে আয়বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কালগণনা হইবে ও সন্তান-সন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনাক্রম থাকিবে।

সে বাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আশ্চর্যান্বিতের চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার স্ত্রীলোক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন ও রাজ্য খেতাব প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণী ও চাকনদুর্গ এবং তৎপার্ষস্ব দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জয়গীরস্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জয়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীস্থর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্ত যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকবরশাহ কতক পরিনাণে জয়লাভ করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও সেই উত্তমে ব্যাপ্ত রহিলেন। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুস্থ ছিলেন না। ১৬২০ খৃঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান

সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন, ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজিহান সেনাপতি শাহজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিয়া অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাটদিগেব অত্কার অনুগ্রহ কাল থাকে না ; তিন বৎসর পর সম্রাট শাহজীর কতকগুলি জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। শাহজী বিরক্ত হইয়া বিজয়পুরে সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পতনোন্মুগ আহম্মদনগর রাজ্যের স্বাধীনতার জন্তও শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে শাহজী সেই বংশের আর একজনকে সুলতান করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কতকগুলি বিদ্র ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশশাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার পুত্র বিজয়পুরের সুলতানকে দমন করিবার জন্ত বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীস্থরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে ; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল ; আহম্মদনগর রাজ্য বিনুশ্ত হইল (১৬৩৭)। শাহজী বিজয়-পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন, এবং সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন। সুলতান বিজয়পুরের উত্তরে পূনার নিকট তাঁহার ঘেরাপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণ কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাদেয়ের গর্ভে শত্ৰুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্বেই

লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা যাদবরাও পুরাতন দেবগডের হিন্দু-রাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অঙ্গে শাহজী টুকাবাই নারী আর একটি কস্তুর পাণিগ্রহণ করেন। অভিমানী জীজীবাঈ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনর জায়গীরে আনিয়া অবস্থিতি করিতেন। শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কণাটাই থাকিতেন ও তাঁহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুই জন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্মচারী ছিলেন। তন্মধ্যে দাদাজী কানাইদেব পুনর জায়গীর এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খৃঃ অঙ্গে সুবর্ণোদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অশ্রুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ জন্মিল। জীজী মপুত্র পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন। শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নিৰ্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্বে সেই গৃহে সায়েস্তা থাকে দেখিয়াছি।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্পবয়সেই ধর্ম্মরূপ ব্যবহার, বর্ণা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়গ ও ছুরিকা চালন এবং অশ্ব-রোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়সম্রাট্টেই অশ্ব-চালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ

করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই শৃঙ্গ ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায় শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপাস্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্ব গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইত, হিন্দুধর্মের আস্থা দৃঢ়ীভূত হইত, সেই পূর্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইত, ধর্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিত। এইরূপ কথা শুনিতে শিবজীর একুশ আগ্রহ ছিল যে, অনেক বৎসর পর যখন তিনি দেশে খ্যাতি ও রাজ্যালাভ করিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে, বহু নিপদ ও বহু কষ্ট সহ করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকালমধ্যেই স্বধর্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগাঁর হইবার জন্ত নানারূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। আপনার জ্ঞান উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন। তিনি পর্তুগীজপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্তুগীজ ক্রুরে উল্লভন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েক দিন ক্রমাগত এই পর্তুগীজ ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন, কোনও দুর্গ, কোনও পথ, কোনও উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে বিরূপে দুই এক টি দুর্গ হস্তগত করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া, যাহাতে জায়গীর সূচাক্রমে রক্ষিত হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃত্বলা সম্মান করিতেন, কিন্তু যে পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্ত শিবজী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার যৌবনসুহৃদগণের মধ্যে যশজা-কঙ্ক, তন্নজী-মালতী ও বাজী-ফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণদুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আধ্যাত্মিকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়সক্রম উনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের বেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে একটি ভূঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটি নতুন দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম রাজগড় রাখিলেন।

বিজয়পুরের মূলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন, 'ও এঁহ' সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের দিগন্ত কন্দলারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিদ্বুবিদগুণ জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা অনেক বুঝাইলেন। তাহার পিতা বিজয়পুরের অধীনে কাৰ্য্য করিয়া

কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট-বাক্য দ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরন্তর হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎসনা করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উজ্জ্বলিত হইল। তিনি শিবজীকে সন্নেহে বলিলেন,—বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি এবং কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিত-কারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুসরণ কর। এই বলিয়া বৃদ্ধ চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ ক্ষীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ মাত্র।

সেই বৎসরেই চাকন ও কান্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কান্দানার নাম পরিবর্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকা-বাজপের ভ্রাতা বাজী সোণা দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে আপন মাউলী সৈন্ত লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাঁহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে

পুন্নর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সহায়তা করিবার ছলে আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষারূপে আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচুঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না, শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহা-
দিগের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই।
১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কণ্ঠচরী আবাদী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত
কল্যাণীপ্রদেশ জয় করিলেন। তখন বিজয়পুরের সুলতান কৃদ্ধ হইয়া
শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও আদেশ করিলেন যে,
নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই
কারাগৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী
দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি
বৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্রাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও
মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন।
চন্দ্রাও যখন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন শিবজী
নিজ লোক দ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া সহসা
রাত্রিযোগে আক্রমণ করত সেই দুর্গ হস্তগত করেন। তিনি সমস্ত
জৌলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ বৎসরেই প্রতাপগড় নামক
একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করাইলেন। ইহার দুই বৎসর পর শিবজী

মুরেখর ও ত্রিমূল পিজলীকে পেশোয়া করেন, এবং সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। ১৬৫৯ খঃ অব্দে আবুল ফাজেল নামক এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বরোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গর্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তখতের নিকট উপস্থিত করিবেন।

এত সৈন্তের সহিত সমুখবৃদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে দুতের সহিত সাক্ষাৎ ও নানারূপ কথাবার্তা হইল, রজনী যাপনার্থে গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসামারণ বাক্পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহা করিয়াছি, সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি। অয়ং তবানী আনাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু দেব ও দেবালয়ের নিগ্রহকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন; এবং আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে

স্বীকার করিলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে, কার্যাসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যিক।

কয়েক দিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটেই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কক্ষিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবকারোহণে নিদ্রিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্নানপূজাদি সমাপন করিলেন; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ বাচনা করিলেন; ভূগার কৃতি ও উল্লীনের নীচে লৌহ বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; অবশেষে শিবজী দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ও বাল্যসহচর তন্নজী-মালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজলের নিকটে আসিলেন। সহসা আলিঙ্গনক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসল-মানকে ভূতলশায়ী করিলেন! তৎক্ষণাৎ শিবজীর সেনা আবুল ফাজলের সেনাকে পরাস্ত করিল, এবং শিবজী অনেক দুর্গ হস্তগত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আসিলেন।

বিজয়পুরের সহিত বুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অতিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সমুপে খাদন গ্রহণ করিলেন না। কয়েক দিন গুলের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী

পিতা কর্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, শাহজীর জীবদ্দশায় বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করেন নাই। তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি স্থাপন হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কর্ণপ্রদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল। শিবজীর বয়স তখন পঞ্চত্রিংশ বৎসর।

নবম পরিচ্ছেদ

শুভকাৰ্য্য সম্পাদন

যুগে যুগে করে করে মিহা নিবস্তুর,
জলুক গগনবাপী অনন্ত বহ্নিতে ।
জলুক গে দেবতেজ স্বৰ্গ সংবেষ্টয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহক দানবকুল নেবের বিক্রমে,
পুল্পগ্রম্পরা দম্ব চির শোকানলে ।

চৈতন্য বন্দোপাধ্যায় ।

স্বৰ্ঘ্য অন্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুৰ্গের ভিতর
সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে, একপ নিঃশব্দে যে, দুৰ্গের বাহিরের
লোকও দুৰ্গের ভিতর কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই ।

দুৰ্গের একটি উন্নত স্থানে কয়েক জন মহাখোদা দণ্ডায়মান রহিয়া-
ছেন, সেই দুৰ্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর । পূৰ্বদিকে সুন্দর
নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব
পুষ্পপত্র ও দুৰ্গাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে ।
উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র স্বৰ্ঘ্যকিরণে
উজ্জল দেখা যাইতেছে । বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাই-
তেছে, ষোড়শগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অগ্নি রজনীতে

সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে-
ছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পর্বতের পর পর্বত, যতদূর দেখা
যায়, অনন্ত পর্বত অন্তাচলচূড়াবলী স্বর্ষ্যকিরণে অপূর্ণ শোভা
পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি, যোদ্ধগণ এই চমৎকার পর্বতদৃশ্যের
বিষয় ভাবিতেছিলেন না, অত্র চিন্তায় অতিবৃত্ত রহিয়াছেন।

যে হুঙ্কে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত
ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্কনাশ হইতে পারে, তাহার
প্রাকালে মুহূর্ত্তের জ্ঞাত অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অদ্য
সারেস্তা গাঁ ও যোগল সৈন্ত ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসম-
সাহসে মহারাষ্ট্রস্বর্ষ্য একেবারে চির অন্ধকারে অন্ত বাইবে, এইরূপ চিন্তা
অগত্যা যোদ্ধদিগের হৃদয়ে উদ্বেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত
করিলেন না, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ
করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল
বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া
আক্রমণ করিবেন। একুপ ভীষণ কার্য্যে শিবজী কখনও লিপ্ত হইয়াছেন
কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জ্ঞাত চিন্তা-
শেষাচ্ছন্ন না হইবে ?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশোয়া নুরেশ্বর জিহ্ম ছিলেন।
অল্পবয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে বুদ্ধব্যবসায় লিপ্ত
ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ
তিনিই নির্মাণ করেন। চারি বৎসরব্যধি পেশোয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি
সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল
ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর নুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে
আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে যোগলদিগের সহিত বুদ্ধারস্ত

হওনাবধি তিনিই পদাতিক সৈন্তের সরনোবৎ অর্বাং সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্যদক্ষ কর্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় এক জন দূরদর্শী ও বুদ্ধিপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন এবং সম্রাতি রায়গড়ে প্রসিদ্ধ দুর্গ নিষ্কাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অনঙ্গীনন্তও অগ্ন সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে তিনি পবনগড় হস্তগত করেন, এবং শিবজীর কর্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনোবৎ অর্বাং সেনাপতি নিতাইজী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি বিরূপে মোগলসৈন্তের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরম্মাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা সায়েরস্তা দাঁর সভায় চাঁদ খাঁর প্রমুখ্যৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্তাজী শুজর নামক এক জন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বাল্য-সুহৃদদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাগলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তন্নজী-মালশ্রী ও যশজী-কর অগ্ন সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস, ইহারা এখনও তুলেন নাই। ইহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্ত লইয়া শিবজীর সহিত

শত পর্তুগিজ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়া-
ছিলেন।

হৃদয় অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ
হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধামণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান,
এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার
মুখমণ্ডল গভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবাক্তক, ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না।
বস্ত্রের নীচে তিনি বন্দ্য ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অগ্ন নিশির অসম-
সাহসিক কার্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, দৃষ্টি
স্থির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন,—সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অগ্ন রক্তনীতে স্বর্ণদেব কি
অন্নজী কি আমাদের সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাশয়! বিপদকালে
কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিমাছি?

শিবজী। পেশোয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না।
আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার
নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু অগ্ন ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি
অগ্ন বিবম প্রতিজ্ঞা করিমাছি, অগ্ন আগিই এই কার্য সাধন করিব,
নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ করুন, জয়লাভ
করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অগ্নকার কার্যে নিধন প্রাপ্ত হই,
তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল।
আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দুঃদশী বুজিবলে দেশ
থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা
করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন, আর অনুরোধ করা বুঝা, স্মৃতরাং আর কিছু

বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বর শিবজী পেশোয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কাৰ্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি।

মুরেশ্বর, আবাজী ও অন্নজী সজ্জননয়নে মহারাজী-বীরকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী মুহম্মদদত্ত তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাল্যমুহুর্দ্দ! বিদায় দাও।

তন্নজী। প্রভু! কি অপরাধে আমাদেরকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্বকাল স্বরণ করিয়া দেগুন, কঙ্কণ-দেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়, উপত্যকায়, পর্বত-গহবরে, তরঙ্গিনীতীরে কে আপনার সহিত দিনব্যাপী শীকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কাজে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন, এক প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এ স্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই। আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যমুহুর্দ্দকে বঞ্চিত করিবেন না।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল। মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই, শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনী জীজী

একাকী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অসুস্থতার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন,—মাতঃ ! আশীর্বাদ করুন, বিদায় হই।

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—বৎস ! আইগ, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে।

শিবজী। মাতঃ ! আপনার আশীর্বাদে কবে কোন বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ? কোন ঘৃণে জন্ম না হইয়াছি ?

জীজী। বৎস ! দীর্ঘজীবী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মাতা স্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন ; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল। এক্ষণে আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দয় ছলছল করিতে লাগিল। উদ্বেগ কম্পিত স্বরে শিবজী বলিলেন,—স্নেহময়ি জননি ! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব।

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন,—বৎস ! হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শত্রু তোমার সাহায্য করিবেন। আমার পিতৃকুল দেবগণের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্মের অবলম্বন ছিলেন। বাছা ! আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তুমিও মহারাত্রীদেশে রাজা হও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের অবলম্বন হও।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অস্বারোহণ করিলেন। নিঃশব্দে সৈন্তগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা

শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নায়াইল। শিবজী তাহাকে -চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার! এ সময়ে তোমার কি প্রার্থনা?

রঘুনাথ। প্রভু, যে দিন তোরণ-দুর্গ হইতে পত্নাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অজ্ঞ এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই -যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে যাইতে দিন। যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত যাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুতবালক! কেন ইচ্ছাপূর্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? অল্পবয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন্! আপনার সঙ্গে যাইলে প্রাণ হারাইব, একপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার অজ্ঞ আক্ষেপ করিবে, জগতে একপ কেহই নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ বেশ গুরুগুলি ভ্রমরবিনিমিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিতি-প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনর ভিতর যাইতে অমুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পবে লক্ষ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পূনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য

রাখিলেন। সন্ধ্যায় ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা-সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জ্বলিলে বা সৈন্তেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই গুপ্ত কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্ত-সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী অগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনর নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পৌছিয়া তথায় লুকাইত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ায় মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আত্মকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যায় নীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্মর শব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পূনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্ৰমে পুনর গোলমাল নিস্তক হইল, দীপাংলী নির্মাণ হইল, নিস্তক নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃংগালের স্বর বায়ুপথে আসিতে লাগিল। ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল, শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল। সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন। বহু লোকে দীপাংলী লইয়া বাস্ত করিতে করিতে অশস্ত্র পথ দিয়া আসিতেছে,— এই বরষা ত্রা !

বরষা ত্রা নিকটে আসিল। পুনর চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ ও নানা বাস্তযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চরব হইতেছে। অনেক অঝারোহী ; অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বালাসুহৃদ্ তরঙ্গী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন । পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র । “হয় ত এই শেষ বিদায়” —এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক । নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন ।

যাত্রিগণ সায়েস্তা খাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোক-সমারোহ দেখিতে লাগিলেন । ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল ; কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন । যাত্রী-দিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন থা সাহেবের গৃহের নিকট লুকায়িত রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না । ক্রমে বরখাজার গোল থামিয়া গেল ।

রজনী আরও গভীর হইল । সায়েস্তা খাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল, তথায় অন্ন অন্ন শব্দ হইতে লাগিল । থা সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ করিলেন না ।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, খুর্-খুর্ করিয়া বাজুকা পড়িল । নারীগণ সন্দিগ্ধ হইয়া দেখিতে আসিলেন, ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা পিপীলিকা-সারের জায় গৃহে প্রবেশ করিতেছে । তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া সায়েস্তা খাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন ।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনায় মিনতি করিতেছেন, থা সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনঃ হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন ।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন, বর্ষধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অস্ত্র দ্বারে আসিলেন, তাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমনত সময়ে ভুলিলেন, “হর হর মহাদেও” বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুত্রী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেরই হত ও আহত হইয়াছিল। তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেঁধেন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরবে সেই প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। প্রাসাদের দীপ নির্ঝাঁগ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া ঘৃণ করিতে লাগিল, অন্ধকারে হিন্দু ও মুসলমান ঘৃণ করিতেছে। কবাটের ঝন্ঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুমুহুঃ উল্লাসরব, এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ণাহস্তে লক্ষ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন, “হর হর মহাদেও” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, যোগল প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্ষাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সায়েস্তা খাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েক জন যোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন, সম্মুখে বৃত চাঁদ খাঁর বিক্রমশালী পুত্র শম্শের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন, কোণে খুঁজা রাখিয়া বলিলেন,—যুবক, তোমার

পিতার রক্তে এখনও আমার হস্ত কলুণিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।

শম্শের খাঁ উত্তর করিলেন না। শম্শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত। শিবজী আগ্নেয়কর প্রয়াস পাইবার পূর্বেই শম্শেরের উজ্জল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্তের জন্ত প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন। সহসা দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটি বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শম্শেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘুনাথজী হাবিলদার!

শিবজী। হাবিলদার! এ কার্য আমার অরণ থাকিবে। বেবল এইমাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ দিয়া রক্ত্র অবলম্বন করিয়া গায়েস্তা খাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্‌মুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা গায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু গায়েস্তা খাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল ফতে খাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইল। তখন শিবজী দেখিলেন, ঘর, প্রাঙ্গণ, বারান্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরিগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, জীলোক ও পলাতকগণের আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, মাউলীগণ যোগলদিগের ধ্বংসসাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্ন মুণ্ড, কোথাও বা রক্তপ্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে, সকল যুদ্ধেই, তিনি জয় লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ

দেখিলে বিরক্ত হইতেন, এবং শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ সাহায্যে না হয়, সে জন্ত যথেষ্ট যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করিলেন,—আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তীক্ষ্ণ সায়েস্তা থা আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন। প্রায় দুই কোশ আসিয়া মশাল জালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জলিল। পুনা হইতে সায়েস্তা থা দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পরদিন প্রাতে ক্রুদ্ধ যোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কর্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অসারোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অন্ন বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সায়েস্তা থা সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্তের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে, এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ণ্যা বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং নিজ পুত্র মুলতান মোয়াজ্জীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্ত যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজ্য

উপাধি গ্রহণ করিলেন, ও নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন ।
আমরা এখন এই নব ভূপতির নিকট বিদায় লইব ।

পাঠক ! বহুদিবস হইল, তোরণ-দুর্গ হইতে আসিয়াছি ; চল এই
অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি ।



দশম পরিচ্ছেদ

আশা !

যদি পোড়া আঁখি বগি রসালের তলে,
প্রাণ্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সম্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া ছুরু ছুরু করি
স্তনি যদি পদশব্দ !

যধুসুদন দত্ত ।

যে দিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যে দিন তাঁহার হৃদয় উৎক্লিষ্ট হয়, সেই দিন প্রথম প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে একটি বালিকা-হৃদয় ভাগিয়া গিয়াছিল। উজ্জানে সন্ধ্যার সময় যখন সরযুর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ স্বদেশীয় যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকা সহসা চমকিত হইলেন। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অপরূপ দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর যাইলেন।

রজনীতে সরযু সেই স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে যাইলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনির্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন চারি চকুর নিলন হইল, তখন লজ্জাবৃত বদন ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে একটি নূতন ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহার দিকে সোচ্চেষ্ট দৃষ্টি করিলেন কেন ? রঘুনাথ কি স্বদেশীয়

বালিকার প্রতি একটু স্নেহের সহিত নয়নক্ষেপ করিয়াছেন? তরুণ যোদ্ধার কি সরসুর প্রতি একটু মমতা জন্মিয়াছে?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয় একটু উদ্বিগ্ন হইল। পরে যখন রঘুনাথের অনিন্দনীয় বাক্যগুলি শুনিলেন, রঘুনাথ যখন সরসুর গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দ ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অস্বাক্ষর হইয়া চলিয়া গেলেন, সরসু গবাক্ষপাশ্বে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিম্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালােকে পর্বতমালা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর যত দূর দেখা যায়, পর্বতবৃক্ষ সমূহের লহরীর মত বায়ুতে হুলিতেছে। উপরে পর্বতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল একটি নদীৰূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটির দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্রর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্বতকন্ঠা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, ও মেঘবিবজ্জিত স্থা এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিলোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু সরসু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে গুস্ত ছিল না।

সরসু অল্প সময় দিন একটু অশ্রমবদ্ধা রহিলেন। সাংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন, স্বহস্তে পিতার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, নিশ্চক্ৰ রজনীতে সরসু উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপাশ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চিন্তা

এস তুমি. এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বশ্ম, চন্দ্র, অসি, তুণ, ধনুঃ,
তাজি রণ পদব্রজে এস মোর পাশে ।

মধুসূদন দত্ত ।

জনার্দন স্বভাবতঃই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাজাহানাবাদ বা দেবপুজার রত থাকিতেন, প্রভাতে সাঙ্ক কালে কিন্না-দারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। পালিতা কত্নাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কত্নাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযু বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন। বালিকার মনে এক দিন একটি নূতন ভাব উদয় হইল, বৃদ্ধ জনার্দন কেমন করিয়া জানিবেন ?

বালিকার হৃদয়ে এক দিন সহসা যে ভাব উদয় হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয় না। এক দিন সন্ধ্যাকালে সরযুর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্বেগ হইল, তাহা দুই চারি দিবসের মধ্যে অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি নারীর হৃদয়ে একরূপ ভাব একেবারে লীন হয় না, মধ্যে মধ্যে সেই তরুণ যোদ্ধার কথা সরযুর হৃদয়ে জাগরিত হইত। বিশেষ সরযু

জন্মাবধি একাকিনী, জনার্দন ভিন্ন তিনি ভালবাসিবার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, স্মৃতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম যৌবনে যে রূপ দেগিয়া এক দিন সরস্বতী হৃদয় আলোড়িত হইল, সাময়িকালে, প্রভাতে ও গভীর রজনীতে সেই রূপটি সময়ে সময়ে সরস্বতী হৃদয়ে জাগরিত হইত।

কল্পনা মায়াবিনী। সরস্বতী যখন দিনান্তে একাকিনী গবাক্ষ-পাশে বসিয়া থাকিতেন, অথবা নিশীথে চন্দ্রালোকে সেই পুষ্পোচ্চানে বিচরণ করিতেন, তখন কতরূপ কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত। সেই তরুণ যোদ্ধা এত দিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীর নাম ক্রয় করিতেছেন, সরস্বতী কথা কি একবার তাঁহার মনে জাগরিত হয়? পুরুষের মন। নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, নানা আশায় অভিবাহিত হয়, আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তাহার কি এক চিন্তা চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করে? তথাপি মায়াবিনী আশা সরস্বতীকে কাণে কাণে বলিয়া দিত,— বোধ হয়, কখন কখন সরস্বতীর কথা তরুণ যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হয়।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ তোষণ-দুর্গের কথা ভাবেন? এ কালে, এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নদীর উর্ষি পার্শ্বস্থ পুষ্পটিকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর উর্ষি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়; কিন্তু জল আর ফেরে না! তথাপি মায়াবিনী আশা সরস্বতী

কাণে কাণে বলিয়া দিত—বোধ হয়, একদিন সেই তরুণ যোদ্ধা
তোরণ-দুর্গে ফিরিয়া আসিবেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পৰ্ব্বতমালা চক্রেয় সূধা-
কিরণে নিস্তন্ধে মুগ্ধ হইত, তখন নীল আকাশও শুভ্র চক্রেয় দিকে চাহিতে
চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত কল্পনা উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ
হইত যেন, সেই পৰ্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতে-
ছেন। অশ্ব খেতবর্ণ, অশ্বারোহীর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ, ললাট ও নয়ন দ্বিধা
আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন,
যেন তাঁহার মস্তকে সূবর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ শৃগোল বালুতে সূবর্ণের
বাজু, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা। যেন যোদ্ধা আবার আহাৰ করিতে
বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। অথবা রজনীতে
সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার নিকট সলজ্জ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,
যোদ্ধাও যেন আনন্দের সহিত সরযুর নিকট বুদ্ধকথা বর্ণনা করিতেছেন।

কল্পনার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রহিম্মালের জায় একটির পর আর
একটি আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযু আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ
হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি
পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত
সরযুর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে
দীপ জলিতেছে, বাজ বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হই-
তেছে সরযু জানেন না, ভাল দেখিতে পাইতেছেন না। যেন সরযু
অবগুষ্ঠনবতী হইয়া সেই দেব-প্রতিমূর্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের
হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিত হস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই
জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। আনন্দে বালিকাহৃদয় ক্ষীত হইল। সরযু!
সরযু! পাগলিনী হইও না!

আবার কল্পনা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতি্যাপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সন্ন্যাসকে বিবাহ করিয়া-ছেন। পর্তুতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শাস্ত্রিবাহিনী নদী চক্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, সেখানে হরিদ্রবর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চক্রালোকে স্তম্ভ রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটারের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটার সরস্বতী! যেন দিবা-বসানে সরস্বতীসহস্রে বহনকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবন-নাথের জন্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটার-সম্মুখে সুন্দর দুর্কার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। যেন সরস্বতী দূরক্ষেত্রের দিকে চাহিয়াছেন, যেন সেই দিক হইতেই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটারাভিমুখে আসিতেছেন। সরস্বতী হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া সন্ন্যাসকে একটি কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন। পুলকে বালিকার হৃদয় আবার স্পন্দিত হইল, সরস্বতী! সরস্বতী! পাংগলিনী হইও না।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতীত হইল, বৎসর অতি-বাহিত হইল, কিন্তু সরস্বতী কল্পনালহরী শোন হইল না। যে স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে সন্ন্যাস এই বিদেশে একদিন সন্মুখে খাওয়াইয়াছিলেন, তাঁহার কমনীয় মুখখানি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে বালিকার মনে জাগরিত হইত। যে দীর্ঘকায় পুরুষ সন্মুখে সরস্বতীলার গলায় প্রিয় কণ্ঠহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দনীয় রূপ ও দেবভুল্য আকৃতি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই সরস্বতী হৃদয়ে উদ্ভিত হইত। কল্পনা কি মায়াবিনী?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পুনর্জন্ম

—চেতন পাইয়া

মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে !

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী মায়াবিনী নহে, সরযুবালার চিত্তা মিথ্যাবাদিনী নহে, বালিকার আশা বিশ্বাসঘাতিনী নহে ।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযু পুনরায় সেই পুষ্পোজ্জ্বল পুষ্প তুলিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে কি মনে করিয়া হৃদয়ের সেই কণ্ঠহারের দিকে নিরীকণ করিতেছেন ! সরযুর রূপ পূর্ববৎ স্নিগ্ধ ও আনন্দময়ী, সরযুর মুখমণ্ডল পূর্ববৎ কমণীয় ও শাস্ত । তথাপি এক বৎসরে সে রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, নব আশা ও নব উল্লাসে সে মুখমণ্ডল অধিকতর কমণীয় কাস্তি ধারণ করিয়াছে । নূতন জ্যোতিতে সে চক্ৰবৰ্ত্তী আলোকিত হইয়াছে, নূতন উদ্বেগ ও নূতন লাভণ্যে সে শরীর টলমল করিতেছে, সরযুর হৃদয়, মন, দেহ পরিবর্তিত হইয়াছে, সরযু বালিকা নহেন, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন । রূপবতী, চিত্তাবতী, যৌবনসম্পন্ন সরযুবালী পুষ্প তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই কণ্ঠমালার দিকে দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, একরূপ সময়ে দ্বারদেশে একজন তরুণ রাজপুত্র যোদ্ধা অথ হইতে অবতরণ করিলেন ! পুষ্প তুলিতে তুলিতে রাজপুত্রকুমারী

সেই দিকে চাহিলেন,—সহসা শিহরিয়া উঠিলেন,—সে দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না।

রাজপুত্র যোদ্ধা সেই পুষ্পোচ্ছানে সেই রাজপুত্রবালাকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন। একদিন নিশীথে বাহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, এক দিন প্রভাতে বাহার পবিত্র কর্ত্তে প্রিয় বর্ধমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে ও সঙ্কটে, শিবিরে ও সৈন্তমধ্যে বাহার চিন্তা মধ্যে মধ্যে যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, নিশীথে স্বপ্নযোগে বাহার কমলীয় লজ্জারঞ্জিত মুখখানি সফদাই যোদ্ধার সম্মুখে উদয় হইয়াছে, অল্প বহু দিন পর সেই আনন্দনীয় রূপলাবণ্য, সেই লজ্জারঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া রঘুনাথ ক্ষণেক বাক্যশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযুর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে একরূপ দৃষ্ট আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রণয়োগ্রাসে উৎক্লিষ্ট হয়, যখন নবজাত চন্দ্রকরের জ্যাম নবজাত প্রণয়ের আনন্দহিলোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন যৌবনের প্রথম প্রণয়ে সমস্ত জগৎ সিক্ত করে, আকাশ ও মেদিনী প্রাবিত করে, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুত্রী অবতীর্ণ হয়! ক্ষণেক পর সরযুবাল। অবনতমুখী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, ও পিতাকে এই রঘুনাথজীর আগমনের সংবাদ দিলেন। জনার্দন দেবও বহু সম্মান সহকারে শিবজীর দূতকে আহ্বান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুরোহিতের সম্মুখে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। শান্ত্রিপাখা পরাস্ত হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শিবজী রাজগড়ে বাইরা রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দেশশাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট শিবজীকে জয় করিবার জন্ত অস্বরাধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ

করিতেছেন, তাহা শুনিয়া মহারাজু রাজ চিন্তিত হইয়াছেন। মহারাজু রাজ সম্ভবতঃ রাজ্য অধিসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন, এবং সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ অস্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত জনার্দন দেবকে অরণ করিয়াছেন। রাজার আজায় রঘুনাথ পুরোহিতকে লইতে আসিয়াছেন, শিবিকাদি প্রস্তুত আছে। যদি পুরোহিত মহাশয়ের সুবিধা হয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজগড় গমন করিলে ভাল হয়, রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ঘরের এক পার্শ্বে সরযুলা আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, পাঠককে বলা বাহুল্য যে, এ কথাগুলি সমস্ত সরযুর কানে উঠিল। পিতা রাজধানীতে যাইবেন? রাজ্যদেশে এই তরুণ যোদ্ধা আমা-দিগকে লইতে আসিয়াছেন?—সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, হস্ত হইতে জলের পাত্র পড়িয়া গেল, লজ্জাবনতমুখী পুলকিতগাত্রী সরযুলা ঘর হইতে নিজান্ত হইল।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জনার্দন দেবের সহিত কি কথা কহিতে লাগিলেন। আপনার দেশের কথা কহিলেন, জাতি-কুলের পরিচয় দিলেন, পিতামাতার পরিচয় দিলেন, জনার্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। জনার্দনও রঘুনাথের উন্নত কুলের পরিচয় পাইয়া এবং বুঝকের বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, গুণ ও বিনয় আলোচনা করিয়া ভূষ্ট হইলেন, এবং রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রঘুনাথের আহারের সময় হইয়াছে, সরযু সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃদ্ধ জনার্দন গাত্রোথান করিয়া ফুটুটিতে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বৎস রঘুনাথ, এখন আহা করিতে বহিল। আজ তোমার পরিচয় পাইয়া বড় ভূষ্ট হইলাম, তোমার বংশ আমার অপরিচিত নহে, তোমার গুণও বংশোচিত। আর সরযুকে আগি বজা বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছি, তোমাকেও আজি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর যদি ভগবান্ করেন, এই যুদ্ধ শেষে তোমার জায় উপযুক্ত পাত্রের সরস্বতীকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া এই মানবলীলা সম্বরণ করিব। জগদীশ্বর তোমাকে ও মা সরস্বতীকে সুখে রাখুন।

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের চক্ষুতে জল আসিল, ধীরে ধীরে পুরো-হিতের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন,—পিতা, আশীর্বাদ করুন, যেন এ দরিদ্র সৈনিক আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। রঘুনাথ দরিদ্র হাবিলদার মাত্র, এক্ষণে তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই। কিন্তু জগদীশ্বর সহায় হউন, পিতা, আশীর্বাদ করুন, রঘুনাথ এ অমূল্য রত্নলাভ করিতে যত্নবান্ হইবে।

এ আনন্দময়ী কথা সরস্বতীর কাণে পৌছিল, বাস্তবিক পত্রের জায় তাঁহার দেহলতা কম্পিত হইতেছিল।

সে দিন রঘুনাথ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, আরক্তমুখা সরস্বতী ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজগড় যাত্রা

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে ছুজনে।

মধুসূদন দত্ত।

যাত্রার আয়োজন করিতে পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইল। রঘুনাথ পুরোহিতের আনন্সেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সরসূকে উত্তানে ফুল তুলিতে দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সরসুর প্রিয় হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। এ পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রঘুনাথ সাহস করিয়া সরসুর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। সরসূকে দেখিলেই রঘুনাথের হৃদয় সজোরে আঘাত করিত, কুমারীও অবগুষ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতেন।

তোরণ-দুর্গ হইতে রাজগড় যাত্রাকালে সরসুর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে একজন অখারোহী চলিত, পর্বত-পথে বা জঙ্গলে, বৃক্ষশূন্ত ময়দানে বা নদীতীরে, সে অখারোহী যুহুর্ভের জন্তুও শিবিকা হইতে দূরে বাইত না। নিশীথে যখন সরসু সহচরীর সহিত সামান্ত কোন মন্দিরে, দোকানে বা ভদ্রগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, রজনীতে সময়ে সময়ে একজন অনিদ্র যোদ্ধা বর্ষা হস্তে তথায় পদচালন করিত।

নারীযাত্রাই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারে, এ সকল বিষয় দেখিতে পায়। পুরুষের যত্ন, পুরুষের আগ্রহ, পুরুষের হৃদয়ের আবেগ নারীর

চক্ষুতে গোপন থাকে না। সরযু শিবিকার ভিতর হইতে সেই অবিনাশ্ত অস্বারোহীকে দেখিতেন, নিশীথে সেই অনিদ্র যোদ্ধাকে দেখিতেন। সেই দেব-বিনন্দিত আকৃতি দেখিতে দেখিতে সরযুর নয়ন ঝলসিত হইল, সেই দুর্দমনীয় আগ্রহ-চিহ্ন দেখিয়া সরযুর হৃদয় আনন্দ, প্রেম ও উদ্বেগে প্রাণিত হইল।

সন্ধ্যার সময় যখন সরযু সেই যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে আসিতেন, মৌনাবলম্বী যোদ্ধার দর্শনে সরযু অবনতমুখী হইতেন, ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে শিবিকায় আরোহণের সময় যখন সরযু সেই যোদ্ধাকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাঁহার স্নান মুখমণ্ডল হইতে সরযু সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না।

কয়েক দিন এইরূপে ভ্রমণানন্তর সকলে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন। জনার্দন সন্ধ্যার সময় দুর্গের নীচে একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়-রাজের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, রাজার অনুমতি হইলে পরদিবস দুর্গে প্রবেশ করিবেন।

সেই দিন রজনীতে আহাৰাদি প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। জনার্দন কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় সরযুবালা রঘুনাথকে ভোজন করাইলেন।

ভোজনান্তে রঘুনাথ অষ্ঠদিনের ত্রায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন না, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর যেখানে সরযু একাকী বসিয়াছিলেন, তথায় দ্বারে দ্বারে খাইয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া স্থিরভাবে কহিলেন,—
দেবি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।

রঘুনাথের উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন হৃষিকেশের পক্ষে বারিবার

ক্রমে সরস্বতী কাণে লাগিল। সরস্বতী হৃদয় নাচিয়া উঠিল, সরস্বতী আরক্ত মুখ
নত করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইলেন।

রঘুনাথ পুনরায় বলিলেন,—দেবি, বিদায় দিন, কল্যাণ আপনারা
রাজপ্রাসাদে যাইবেন, এ দরিদ্র সৈনিক পুনরায় নিজ কার্যে যাইতে
বাসনা করে।

এই কথা শুনিয়া সরস্বতী লজ্জা বিস্তৃত হইলেন, নয়নদ্বয়ের জল মুছিয়া
নারীর মমতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—আপনি আমাদের জন্ত যে যত্ন
করিয়াছেন, নিতান্ত জন্ত, আমার জন্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন,
তাহার জন্ত ভগবান্ আপনারকে যুদ্ধে জয়ী করুন, আপনার
মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আমরা সে যত্নের কি প্রতিদান করিতে
পারি ?

রঘুনাথ বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন, রাজাদেশে আপনাদিগকে
রাজগড়ে নিরাপদে আনিতে পারিয়াছি, এটি আমার পরম ভাগ্য,
ইহাতে আমার কিছু গুণ নাই। তথাপি দরিদ্র সৈনিকের যত্নে যদি
তুচ্ছ হইয়া থাকেন, তবে,—তবে,—এ দরিদ্র সৈনিককে বিস্তৃত
হইবেন না।

কথাটি সরস্বতী বুঝিলেন, মুখখানি অবনত করিলেন। রঘুনাথ তখন
সাহস পাইয়া, লজ্জা বিস্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এ দরিদ্র
সৈনিক যদি উচ্চ আশা করিয়া থাকে, আপনি অপরাধ লইবেন না।
আপনার পিতা প্রসন্ন চক্ষুতে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, ভরসা করি,
আপনিও আমার প্রতি অগ্রসর হইবেন না। যদি ভগবান্ আমার
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, যদি জীবনের চেষ্টা ও আশা কলবতী হয়, তবে
একদিন মনের কথা বলিব, সে পর্য্যন্ত এ দরিদ্র সৈনিককে এক একবার
স্মরণপথে স্থান দিবেন।

বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া রথুনাথ চলিয়া গেলেন। সরস্ব এক-দণ্ডকাল সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; দ্বিপ্রহর রজ্ঞীর সময় একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—সৈনিকশ্রেষ্ঠ! তুমি চিরকাল এ দাসীর অরণ্যপথে জাগরিত থাকিবে, ভগবান্ সাক্ষী থাকিবেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা জয়সিংহ

নরকুলোত্তম ভূমি—

বিজ্ঞা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে ।

মধুসূদন দত্ত ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব, সায়েস্তা খাঁ ও যশোবন্তসিংহ উভয়কেই অকর্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া-
ছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজ্জীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, এবং
তাঁহার সহায়তার জন্ত যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও
বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সত্ৰাট অবশেষে তাঁহাদিগকে
স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার
সহিত দিলওয়ার খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে
দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষভাগে
জয়সিংহ পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সায়েস্তা খাঁর ভ্রাতা নিকুৎসাহ
হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলওয়ার খাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ
করিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং সিংহগড় কেঁচন করিয়া রাজগড়
পর্যন্ত সৈন্তে আগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাজয়, বিশেষ জয়-
সিংহের নাম, সৈন্তসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোহুপ্রভাপ তাঁহার নিকট

অবিদিত ছিল না। সেক্ষণ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট আর-জীবের আর কেহই ছিল না। তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বের্নিয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের জ্ঞান বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোত্তম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ প্রথমে এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিষস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ জ্ঞানশালী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আগিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুঃপাশে করিতেছেন না। তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম। রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, গেজ্ঞ আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অগ্রথা হয় না।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে গভীর মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন,—একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

সভাসদৃ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরান্তরে আনিলেন ও রাজগৃহিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সন্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ কণেক মিঠালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সন্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপন গৃহের জায় বিবেচনা করিবেন।

শিবজী। রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথপন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সন্মানিত হইয়াছি।

জয়সিংহ। হাঁ, রঘুনাথ ভায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ আছে। রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা করিব, দিল্লীখর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সন্মান করিবেন। এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, রাজপুত্রের কথা অত্থা হয় না।

এইরূপে কণেক কথোপকথনের পর সভা ভঙ্গ হইল, শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিল না। তখন শিবজী কপট আনন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্তে গুণ্ডুল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

জয়সিংহ। রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষম হইয়া থাকেন, সে খেদ নিশ্চয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত্র বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অত্থই রাজনীতে আমার অশালা হইতে অব বাহিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন। আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোন রাজপুত্র আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি, ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম কদাচ বিশ্বত হইব না।

শিবজী। মহারাজ। ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দুধর্মের জন্ত, যে হিন্দুগৌরবের জন্ত চেষ্টা করিয়াছি, সে মহৎ উদ্দেশ্য, সে উন্নত উদ্দেশ্য আজি শেষ হইল, সেই চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সেজন্তও এখন খেদ করিতেছি না।

জয়সিংহ। তবে কি জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?

শিবজী। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরবগীত গাহিতে ভাল-বাসিতাম, অত্ম দেখিতাম, সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম থাকে, তবে রাজপুতশরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ! সেটি প্রকৃত ক্রোধের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করে নাই, যত দিন সাধ্য, দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বিধির নিকটকে পরাধীন হইয়াছে। মেওঘারের বীর-প্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনেরও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সন্ততিও দিল্লীর করগ্রস, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।

শিবজী। আজি, সেই জন্তই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ষাহাদের সহিত আপনাদিগের এত দিনের বৈরভাব, তাহাদের কার্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্ত?

জয়সিংহ। যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহার কার্য্যসিদ্ধির জন্ত সত্যদান করিয়াছি। যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি, তাহা করিব।

শিবজী। সকলের নিকট সকল সময় কি গত্য পালনীয়? যাহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্মের বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত সত্য সঙ্গ কি?

জয়সিংহ। আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, তাহারা বহুশত বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কখনও সত্য লজ্বন করে নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছে, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছে, কিন্তু জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, বিপদে, সর্বদা সত্য-পালন করিয়াছে। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবাবিত। ক্ষত্রিয়রাজ চৌডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত দিল্লীখবেরের বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কেহ কখনও ত্রুণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকট যাহা সত্য করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাজ্জীবন! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র অনেক সন্ধিপত্র লভ্বন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লজ্বন হয় নাই।

শিবজী। মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী, তিনি মুসলমানের জন্ত হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া-ছিলেন।

জয়সিংহ। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিনয়, তাঁহার মাড়ওয়ারীসেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সাহায্যে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া

আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, আমি তাঁহাকে সত্ৰাট বুলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষার্থে সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বুলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীখবরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুগলমানের কার্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রত গ্রহণ করিয়া, তাহা লঙ্ঘন করা অলোচিত কার্য্য হয় নাই, যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরশি ব্রান করিয়াছেন। তিনি সিপাহীদী-তীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।

চতুর শিবজী দেখিলেন, অয়সিংহ যশোবন্তসিংহ নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন,—হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?

অয়সিংহ। আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ভগবানের সাক্ষাতে আপনায় সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেক্রপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জ্ঞাত? সত্ৰাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধা-চরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ অলোচিত কার্য্য নহে।

শিবজী। তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিলে দিল্লীখবর অত্র সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।

অয়সিংহ। যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য, কপটাচরণ ক্ষত্রিয়ের অবমাননা।

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন,—রাজপুত! মহারাত্রীরেও মৃত্যু-ভয় করে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দুস্বাধীনতা, হিন্দুগৌরব পুনঃস্থাপিত

হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্তে এই বন্ধঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারি। অথবা রাজপুত্র, আপন অব্যর্থ বর্শা ধারণ করুন, এই হৃদয়ে আঘাত করুন, সহাস্ত্রবদনে প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু যে হিন্দুগৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্ত শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্ৰুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শক্রমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে চিন্তা করিয়াছি, সে গৌরব ও স্বাধীনতা আশা ত্যাগ করিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগে। যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি সে স্বাধীনতা রক্ষা হইবে ?

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, —সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্যলজ্জ্বনে হইবে ? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে ?

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেককণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,— মহারাজ ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার জ্ঞায় ধর্মজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য, একটি কথা। জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সংপরামর্শ দিন। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদ্ভিত হইত। ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্ত আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ধর্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে ঝড়া গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম ! যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দুনায়েমের গৌরব, হিন্দুধর্মের প্রাধাত্য, হিন্দুস্বাধীনতা সংস্থাপন ! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয়

করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি। ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্নমাত্র? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।

বহুদূরদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকটে অবিলম্বে নাহি, আমি শত্রুর নিকটে, নিজেদের নিকটে আপনার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে আপনার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত্র স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্তৃত হয় নাই। আর শিবজী! আপনার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে, চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না। যত্ন, চেষ্টা, সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিনাস-প্রিয়তাম জর্জরিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতি অভ্যুত্থানে শাপপ্রাপ্ত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ভ্রাতা আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিমাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্ত। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অকুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবনভেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্রাণিত হইবে। শিবজী! আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগলপ্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্ত?

জয়সিংহ। সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি, তাহা

পালন করিব। কিন্তু অসাধ্যসাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।

শিবজী। ভাল, সত্যপালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকটেও আপনাদেবতার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাত্ত বিস্মিত হইয়া আপনাদেবতার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি বুদ্ধিবলে স্বদেশের উন্নতি-সাধনের প্রয়াস পাই, আরংজীবকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা কি নিন্দনীয়?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, বিশেষতঃ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য, বোধ হয় তাহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবে। কিন্তু শিবজী! অস্ত্র আপনি যে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অস্ত্র আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অস্ত্র আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সমুখ যুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যশুক্র, গুরুর ত্রায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিন। অস্ত্র আপনি মন্দ-শিক্ষা দিলে শত বর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বুদ্ধ বহুদশী রাজপুত্রের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সমুদ্রবর্ণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন। আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ। আপনাদেব মহৎ উদ্দেশ্যে আমি শতবার ধর্ম্মবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের

শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্যের ফল কলকাল-
ব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে!

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক শুভিত হইয়া রহিলেন, শেষে
বলিলেন,—আপনি গুরু গুরু, আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য।
কিন্তু অগ্ৰ আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে
দিব?

জয়সিংহ। জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অগ্ৰ আমার জয়
হইল, কল্য আপনার জয় হইতে পারে। অগ্ৰ আপনি আরংজীবের
অধীন হইলেন, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পারেন।

শিবজী। জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের
সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বুধা। স্বয়ং
ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিবেদ্য করিয়াছেন।

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ বৃদ্ধ
শরীর কত দিন থাকিবে? কিন্তু যত দিন থাকিবে সত্যপালনে
বিরত হইবে না।

শিবজী। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

জয়সিংহ। শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন। আমি আরংজীবের
পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য
করিতেছি; যত দিন জীবিত থাকি, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহ-
চরণ করিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাজ্জীবের
গৌরব ও হিন্দুর প্রাধান্ত অনিবার্য্য। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করুন, মোগল-
রাজ্য আর থাকে না, হিন্দু-তেজ আর নিবারিত হয় না। অচিরে দেশে
দেশে হিন্দুর গৌরবনাম, আপনার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

ধর্ম্মাত্মন! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন
সার্থক হয়! আপনার সহিত যুক্ত করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি,
কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে
কত্রিয়প্রবর! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর
একদিন পিতার চরণোপাস্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুৰ্গবিজয়

চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ

উথলিল, সিদ্ধ যথা বন্দি বায়ু সহ নিৰ্বোধে।

মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন হইল। শিবজী যোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুৰ্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে ষাতিংশৎ দুৰ্গ অধিকার বা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও বিংশটি ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট ষাদশটিমাত্র আরংজীবের অধীনে জায়গীরস্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সত্ৰাট্টকে দিলেন, তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সত্ৰাট্ট শিবজীকে দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচহাজারীর মঙ্গলদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত বুদ্ধগমাস্ত্রির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীখবের অধীনে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিঙ্কানবজীর বিপদকালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মৃত হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে

সমুচিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী আদিনশাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউনী সৈন্যদ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল। উভয়ে সর্বদাই একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য যে, শিবজীর একজন তরুণ হাবিলদার সর্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে ?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দিন ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন। রঘুনাথও অবসর পাইলেই সেই সরলস্বভাব পুরোহিতের নিকট আসিতেন, তাঁহার নিকট রাজস্থানের সংবাদ পাইতেন, রাজা জয়সিংহের কথা শুনিতেন, স্বদেশের কথা শুনিতেন। কখন কখন বা রজনী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বসিয়া যুদ্ধের কথা কহিতেন, পর্বতদুর্গ আক্রমণের কথা, শত্রু-শিবির আক্রমণের কথা, জঙ্গল বা গিরিচূড়ায় ভীষণ যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিতেন। এ সকল কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধার নয়ন প্রজলিত হইত, স্বর কম্পিত হইত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত। বৃদ্ধ জনার্দিন সভয়ে যুদ্ধবাক্তা শুনিতেন, পার্শ্বের ঘরে নীরবে বসিয়া সরযুবালা সেই জলন্ত কথাগুলি শুনিতেন, নীরবে অশ্রুজল ত্যাগ করিতেন, নীরবে ভগবানের নিকট সেই তরুণ যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় কথা সাঙ্গ হইত, সরযুবালা আহার আনিয়া দিতেন, যতক্ষণ রঘুনাথ আহার করিতেন, সরযু নীরবে সেই দেবমूर्তির দিকে চাহিয়া

চাহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না। ভোজনান্তে যদি যোদ্ধা মুহূৰ্ত্তে বিদায় চাহিতেন, বা অস্ত্র দুই একটি কথা কহিতেন, বেপথুমতী উদ্ভিগ্না সরযুবালা তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না। লজ্জায় তাঁহার গত্তস্থল আরক্তবর্ণ হইত, নয়ন দুইটি মুদিত হইত, অবস্ফূৰ্ণ টানিয়া সরযু সরিয়া যাইতেন, সহচরীকে দিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু উত্তরের আবশ্যক কি? সরযু নয়নের ভাষা রসূনাথ বুঝিতেন, রসূনাথের নয়নের ভাষা সরযু বুঝিতেন। উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ, প্রথম প্রণয়ের অনির্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতেছিল, উভয়ের হৃদয় প্রথম প্রণয়ের উদ্বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

অল্পদিন মধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পৰ্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজেই সৈন্তেরাও পূর্বে কিছুমাত্র জ্ঞানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাঁহার শিবির ছিল, সায়াং-কালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক গ্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন, নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পৰ্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নিশ্চিত হইয়াছে। পৰ্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে বুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অস্ত্রাস্ত্র দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল অঙ্গল ও শিলারাশি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম

স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্বত আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন, তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যখন পর্বত-বিড়ালের ভায় বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলাস্তরে লক্ষ দিতে দিতে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইরা, কোথাও লক্ষ দিয়া সৈন্তগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্ত এরূপ পর্বত আরোহণে সমর্থ কিনা সন্দেহ।

অর্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল। চিন্তা-কুল হইয়া কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক জ্বলিল কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুকে প্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বলিয়াছে, যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। শিবজী নিজ সৈন্তগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বৃক্ষে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল। শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্বতে উঠিতে লাগিলেন।

কণেক পর মহারাষ্ট্রীয়গণ একটি পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্ত বাইলে উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃক্ষের অন্তরালে

দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, প্রায় শত হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই শত হস্ত বিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অল্প পথ অবলম্বন করিলে দূর্গে আসিবার পূর্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী কণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃৎ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী মালত্রীকে ডাকাইলেন, দুই জনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কণেক অতি যত্নেরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইল, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত নৈস্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিল। শিবজীর নিকট আসিয়া অতি যত্নেরে কি কহিল, শিবজী কণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তাঁহাই হউক, অল্প উপায় নাই।

বৃষ্টির জল অবতরণে এক স্থান ধৌত ও ক্ষত হইয়া প্রণালীর স্রাব হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্যস্থল গভীর, সেই প্রণালী দিয়া বৃকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকার শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল। সমস্ত নৈস্ত ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত শত লিশাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তরু অন্ধকার রজনীতে সচল সেনা নিঃশব্দে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরে উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভাবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটি তীর, আর একটি, আরও বহুসংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্ত প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, এবং সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্ত বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর-নিক্ষেপ থামিয়া গেল, কিন্তু শিবজী বুঝিলেন, শত্রুরা তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াছে। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, এখন অনেকগুলি আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরীগণ এদিক্ ওদিক্ যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র পঞ্চাশ হস্ত দূরে। বুঝিলেন, সৈন্যগণ সতর্ক হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অল্প দুর্গ হস্তগত হইবার নহে।

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী এ সমস্ত দেখিল; ধীরে ধীরে বলিল,—রাজন। এখনও নামিয়া যাউবার সময় আছে, অল্প দুর্গ হস্তগত না হয়, কল্য হইবে, কিন্তু অল্প চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। শিবজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অল্প ক্রমশঃ লইব, অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।

শিবজী নিম্নরূপে সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক্ হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্ত সকল

সেই দিকে ধাবমান হইল, এ দিকে প্রাচীরোপরি যে আলোক ছলিতে-ছিল, তাহা নিবিয়া যাইল ! তখন শিবজী বলিলেন,—মহারাষ্ট্রীয়গণ ! শত বুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অস্ত্র আর একবার সেই পরিচয় দাও । তন্নজী ! বাল্যকালের সৌজ্ঞেয় পরিচয় অস্ত্র প্রদান কর ।

প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পৌছিল । রজনী দিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্বত-বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্বরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে ।

রুদ্ধমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী বিংশ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী, বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে । একজন মাউলী নিঃশব্দে একটি তীর নিক্ষেপ করিল, হতভাগ্য প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল ।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন সৈনিক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল । শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিলেন, আর লুক্ষ্মিত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, গৈত্রকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন ।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের “হর হর মহাদেও” বৃদ্ধনাদ গগনে উথিত হইল, একদল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্ত দৌড়াইয়া গেল, আর একদল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমান-দিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল । মুসলমানেরাও শত্রুর

আগমনে কিছুমাত্র তীত না হইয়া, “আল্লাহ আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যেই মহারাত্রীদিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে বৃদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা বর্শাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীরপার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধাগণ সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই ঝড়া বা বর্শাচালন করিতে লাগিল। শত শত মুসলমান বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ত্রায় লক্ষ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও বৃক্ষে অপটু নহে, রক্তস্রোত সেই পঙ্কত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে, ঝোপের ভিতর, শিলারানির পার্শ্বে শত শত মহারাত্রীদিগ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া সেই অব্যর্থ তীরশ্রেণী মুসলমান-সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল।

সহসা এসমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে “শিবজীকি জয়” এইরূপ বজ্রনাদ উথিত হইল, মুহূর্তের জন্ত সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ কারয়া, রক্তাপ্লুত বর্শার উপর ভর দিয়া, একজন রাজপুত যোদ্ধা এক লক্ষের রুদ্ধমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন। তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী গ্রহরীকে ঝড়াচালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ণ যোদ্ধা বজ্রনাদে

“শিবজীকি জয়” শব্দ করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার !

হিন্দু ও মুসলমান এক যুদ্ধের জন্ত যুদ্ধে কাশ হইয়া বিষমোৎফুল্ল লোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মূর্তির প্রতি দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্ৰমক্ করিতেছে, হস্ত ও বাহুদ্বয় রক্তে আশ্রুত, বিশাল বৃক্ষের উপর দুই একটি তীর লাগিয়া রহিয়াছে। দীর্ঘহস্তে রক্তাশ্রুত দীর্ঘ বর্শা, উজ্জল নয়ন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। পোতের সম্মুখে উম্মিরাশির স্তায় শত্রুরা এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে যুদ্ধের জন্ত সচকিত হইয়া সরিয়া গেল, যুদ্ধের জন্ত বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্শাহস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অগণনীয় সকলে নিশ্চল রহিল, পরে আফগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া চারিদিক হইতে বেগে আসিতে লাগিল, রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের স্তায় আসিয়া বেষ্টিত করিল। রঘুনাথ বজ্রা ও বর্শা-চালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবনসংশয়।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল, ব্যাঘ্রের স্তায় লক্ষ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দশ, পঞ্চাশ, দুই তিন শত জন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও বজ্রাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল ! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না।

তখন শিবজী ও তরুজী প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্তগণ বুঝিল, আর এ স্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল।

শিবজী বিহ্বাদ্গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রসৈন্য সেই প্রাসাদ বেঠেন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন,—দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব। নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন,—অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রসৈন্যগণ মশাল আনিয়া দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীর-নিষ্ক্ষেপ দ্বারা প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক মহারাষ্ট্রীয় মশাল হস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাঠ, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জলিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে উখিত হইল ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূর পর্য্যন্ত পর্কিতে ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল, শিবজীর দুর্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীরের বাহা সাধ্য, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের স্তায় মরিতে বাকী ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, তখন রহমৎ খাঁ ও সঙ্গিগণ লক্ষ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। এক একজন এক এক মহাবীরের স্তায় খড়্গচালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গচালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেঁটন করিল, তাহারা শত্রুর মধ্যে একে একে হত হইতে লাগিল। একজন, দুইজন, দশজন হত হইল। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, কিন্তু তখনও সিংহবীর্যের সহিত যুদ্ধ করিতে-ছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেঁটন করিয়াছে, চারিদিকে খড়া উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল,—“কিয়াদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।” ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবজীর সেনাগণ খড়া কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্বাণ করিতেছে, এমন সময়ে শিবজী দেখিলেন, দুর্গের অপর দিকে কুম্ভবর্ণ মেঘের ভ্রাম্য প্রায় পাঁচশত আফগান সৈন্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া পর্বতে উঠিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্বতের তলা পর্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভয় জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কর হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন, পাঁচশত যোদ্ধা দ্রুতবেগে সেই

পর্যন্ত দুর্গ আরোহণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মুখ গভীর হইল। স্তম্ভীক নয়নে দেখিলেন, দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছু-মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ অনিশ্চয় গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর স্তূপাকার হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিকসংখ্যক সৈন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন। তন্নজী ও দুইশত সেনাকে সেই প্রাসাদে সন্নিবেশিত করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার ও গবাক্ষের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধগণকে সন্নিবেশিত করিলেন। কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্ত করিয়া তন্নজীকে কহিলেন,—তন্নজী, শত্রুরা যদি এই প্রাসাদ আক্রমণ করে, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আগিতে দিবার পূর্বে বোধ হয় পরা করা যাইতে পারে, তাহারা এখনও পর্যন্ত আরোহণ করিতেছে, এই সময়ে আক্রমণ করা উচিত। তন্নজী, দুইশত সৈন্ত সহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্ভোগ করিয়া দেখি।

তন্নজী। তন্নজী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহা-রাজীও এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না! কল্লিয়ারাজ! আপনি এই প্রাসাদ রক্ষা করুন, সমস্ত সূক্ষ্মতা করুন। আগন্তুক শত্রুদিগকে তাড়া-ইয়া দিতে আপনার ভৃত্যেরা কি সক্ষম নহে?

শিবজী ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন,—তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক। আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধ-যুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পরামর্শই

উৎকৃষ্ট, এই স্থানেই আমার থাকা বর্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে দুই শত মাত্র সেনা রাইয়া ঐ আফগানদিগকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে ?

পাঁচ, সাত, দশজন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন,—হাবিলদার ! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে তুমি অশ্রুবীৰ্য্য ধারণ কর, অস্ত্র তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। রঘুনাথ ! তুমিই অস্ত্র দুর্গবিজয় আশ্রিত করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নামাইয়া দুইশত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে ন্মনের বহির্গত হইলেন। শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ঐ হাবিলদার রাজপুতজাতীয়, উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হাবিলদার কখনও বংশের বিষয় একটি কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সশব্দে একটি গর্জিত বাক্য উচ্চারণ করে না। একদিন পুন্য রঘুনাথ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত কোনও গুরুদ্বার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজ্য জয়সিংহের সম্মুখে রাজপুত হাবিলদারকে উচিত গুরুদ্বার দিব।

রঘুনাথজী যে কার্য্যের ভার লইলেন, তাহা সম্পন্ন করিলেন। আফগানগণ যখন পর্ত্ত আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রাচীরের উপর হইতে মহারাজীসংগ বর্ষা নিক্ষেপ করিল, পরে “হর হর মহাদেও”

ভীষণনাড়ে বুদ্ধের উপক্রম করিল। সে বুদ্ধ হইল না। প্রাচীরের উপর মশালের আলোকে অসংখ্যক শত্রু দেখিয়া আফগানগণ দুর্গ উদ্ধার করা হুঃসাধ্য জানিয়া পুনরায় পর্বত অবতরণ করিয়া পলাইল। মাউলীগণ পশ্চাদ্ধাবন করিল, উন্নত মাউলীদিগের অব্যবহৃত ছুঁকো ও খড়্গাঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন,—পলাতককে যাইতে দাও, হত্যা করিও না, শিবজীর আদেশ পালন কর। বুদ্ধ শেষ হইল, আফগানগণ পর্বত অবতরণ করিয়া পলাইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের প্রাচীরের স্থানে স্থানে গ্রহরী সংস্থাপন করিলেন, গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন গ্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, দুর্গের সমস্ত ঘর, সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নামাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

যখন উনার রক্তিমচ্ছটা পূর্কদিকে দৃষ্ট হইল, প্রাতঃকালের সুন্দর শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, তখন সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্বতশিখর যোগি-ঋষির আশ্রয়, যেন বুদ্ধের পৈশাচিক রব কখনও এ স্থানে শ্রুত হয় নাই।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিজ়েতার পুরস্কার

ছিন্ন তুষারের ভ্রাম্য বাণ্য-বাঙ্গা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেহারে ।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে ॥
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পরদিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি অপক্লপ সভা সন্নিবেশিত হইল । রৌপ্যবিনির্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চক্রাভূষ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে যুগ্মিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন । চারি পার্শ্বে সৈন্তগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্নের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে । চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীখরের, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে ।

জয়সিংহ সহাস্তবদনে শিবজীকে বলিলেন,—আপনি দিল্লীখরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট তাঁহাঃ দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছেন । এ উপকার দিল্লীখর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে ।

শিবজী । যেখানে জয়সিংহ, সেইখানেই জয় ।

জয়সিংহ। বোধ করি, আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন, তাহা আমি কখনই আশা করি নাই।

শিবজী। মহারাজ! দুর্গ-বিজয় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি সেরূপ অনায়াসে দুর্গ নহৈব বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি নাই।

জয়সিংহ। কেন?

শিবজী। মুসলমানদিগকে জুগুপসাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রত ও সজ্জ। পূর্বে কখনও দুর্গজয় করিতে আমার এত সৈন্য হত হয় নাই।

জয়সিংহ। বোধ করি, এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্কদাই শত্রুরা সজ্জ থাকে।

শিবজী। সত্য, কিন্তু এত দুর্গজয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্তগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষা পাইয়া ক্রমেই সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতিরোধ করা অসাধ্য, শিবজীর জয় অনিবার্য।

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গজয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কন্যা রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে দুই তিন শত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না। শিবজী কণেক শোকাবুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দিগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহস্য খাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত,

কলাকার যুদ্ধের পর কখনওই এ রকম বন্দিক্রমে আছিল। অনেক সময় হত বা ১৭... : : : : : হৃদয় শাস্তিক বদ্ধ তাহার সত সঙ্গ।

শিবজী আদেশ দিলেন — এই বচন শুনে দণ্ড আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয়, দিল্লীশ্বরের কার্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গবিজয়ের পর বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বজুগণ কখন কখন তাঁহাকে এ জন্ত দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎ খাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাদ্ধিক বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহ্যতে তাঁর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে। বীর সদর্পে সভা-সমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীর প্রষ্টকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রক্ত কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—বীরবর। যুদ্ধের নিয়মামুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দিক্রমে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জনা করুন। আপনি এক্ষণে স্বাধীন। জয়-পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার স্থায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সন্মানিত হইয়াছি।

রহস্য খাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ভিত মস্তকের একটি পত্রও ব্যঙ্গিত হয় নাই, কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধ-সময়ে শত্রুসম্মুখে কেহ কখনও রহস্য খাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অথচ বৃদ্ধের দুই উজ্জল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহস্য খাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—
কজিররাজ। কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অথচ আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি বাদশাহের উপর বাদশাহ, জমীন ও আশমানের সুলতান, তিনি এই জন্ত আপনাকে নূতন রাজ্যবিস্তারের ক্রমতা দিয়াছেন।

জয়সিংহ। পাঠান সেনাপতি, আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীখর আপনার ভ্রাতৃ সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীখরকে কি লিখিতে পারি যে, আপনার ভ্রাতৃ বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্তের এক জন প্রধান বর্নচাকরী হইতে সশ্রুত হইয়াছেন?

রহস্য খাঁ। মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সন্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাহার কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। বতদিন এ হস্ত বক্ষা ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্ত ধরিবে।

শিবজী। তাহাই হউক। আপনি অথচ রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌছিয়া দিবে।

রহস্য খাঁ। কজিরবর। আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন,

আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্যা দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্তই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই এক জন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্যলজ্জন করিব না।

এই বলিয়া রহমৎ খাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদান্তিমুখে চলিয়া গেলেন। রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বক্সগণ বুঝিলেন, এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বুঝা, তাঁহার সৈন্তগণ বুঝিল, অস্ত্র প্রসাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, পরে সৈন্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জানিয়াছিলে ?

সৈন্তগণ উত্তর দিল,—এক প্রহর রজনীতে।

জয়সিংহ। তাহার পূর্বে কেহই এ কথা জানিতে না ?

সৈন্তগণ। রজনীতে কোন একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম ; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌছিয়াছিলে ?

সৈন্তগণ। অমুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।

জয়সিংহ। উত্তম, এক প্রহর হইতে বেড় প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে ? কেহ অনুপস্থিত ছিল না ? যদি হইয়া থাকে, প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্ত সহস্র জনের মানি অহুতি। তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে

যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা ভোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, ভোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে, তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্য রজ্ঞীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে, তাহার নাম কর, অন্ত্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে ?

সৈন্তগণ তখন কল্যাকার কথা শ্রবণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শিবজী বলিলেন,—মহারাষ্ট্র ! অস্ত্র যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজনু ! কল্য এক প্রহর রজ্ঞীর সম্মুখে এখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমরা অধীনস্থ একজন হাবিলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যখন দুর্গতলে পহঁছিলাম, তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে ?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিমন্তক ! শিবজীর ঘন ঘন বিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে, সভাতলে একটি সূচিকা পড়িলে বোধ হয়, তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিমন্তকতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—“রঘুনাথজী হাবিলদার !”

সকলে নিমন্তক, বিশ্বসন্তক !

চন্দ্ররাও একজন অসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার স্রাব ভাষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় ক্রমশঃ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্তস্থাপন করিয়া চক্ষুগোচ্রে লক্ষ্য করিয়া সনোষে বলিলেন,—রে কপটাচারি ! বুধা এ কপটে অভিযোগ করিতেছিস ! তোর নিন্দা রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিন্দকের শাস্তি সৈন্তেরা দেখুক।

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ ! প্রভু চক্ষুগোচরের গ্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিম্নরূপ সকলে নির্ঝাক, বিষমস্তব্ধ !

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর প্রতিমূর্তির স্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ! তুমি রঘুনাথ—তুমি এই কার্য্য করিয়াছ ? তুমি যে প্রাতীরলভবনের সময় একাকী দুন্দমনীর তেজে অগ্রগর হইয়াছিলে, তুমি যে দুই শত মাত্র সেনা লইয়া পাঁচ শত আফগানকে দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে,—তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লা-দারকে পূর্ব্ব আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে ?

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, —প্রভু, আমি সে দোষে নির্দোষ।

দীর্ঘকাল নির্ভীক ভরণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিকম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাঁহার বিশাল বকঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে দ্রবীভূত

হইতেছে! কল্য যেক্রপ অসংখ্য শত্রুযধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অস্ত্র তদঃপক্ষা অধিক সঙ্কটযধ্যে বোদ্ধা সেইক্রপ ধীর, সেইক্রপ অবিলম্বিত!

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—তবে কি জ্ঞাত আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রক্তনীর সময় অশুপস্থিত ছিলে?

রঘুনাথের গুষ্ঠ জীবৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ঝাঁকু দেখিয়া শিবজীর সন্দেহবৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল,—ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন,—কপটাচারি! এই জ্ঞাত বীরত্বপ্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।

রঘুনাথ সেইক্রপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,—রাজন! ছলনা ও কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে, বোধ হয়, প্রভু চক্ররাও তাহা জানিতে পারেন।

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিস্বরূপ হইল, তিনি কর্কণভাবে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ! পরিজ্ঞাণ-চেষ্টা বুধা। ক্ষুধার্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জলন্ত ক্রোধ হইতে পরিজ্ঞাণ নাই।

রঘুনাথ পূর্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি মহারাজের নিকট পরিজ্ঞাণ-প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, অগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্ষা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—বিত্রোহাচরণের শাস্তি প্রাপদও।

রঘুনাথ সেই বজ্রযুষ্টিতে তীক্ষ্ণ বর্ষা দেখিলেন, তখনও সেই

অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।

শিবজী আর সহ করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে। একপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইয়া কর্কণশ্বরে কহিলেন,—হস্ত ত্যাগ করুন। রাজপুত্রদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র জুঙ্ক না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—কল্লিয়রাজ! অস্ত্র বাহা করিবেন, কল্যা তাহা অস্ত্রা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অস্ত্র প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল সে জন্ত অশুভাগ করিবেন। যুদ্ধব্যবসায় আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, আমার মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে। কিন্তু সে বিচারে এক্ষণে আবশ্যক নাই; আপনি আমার স্নহদ, স্নহদের নিকট আমি এই রাজপুত্র যোগ্য সোণালিঙ্গা করিতেছি। আমাকে ভিক্ষা দান করুন।

শিবজী জয়সিংহর উদ্রতা দেখিয়া ঈর্ষ্য অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন,—তাত! আমার পরবাক্য মার্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখনও মনে তাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সমুগ্ধ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।

রঘুনাথ সভাস্থল ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়

শিবজী পুনরায় বলিলেন,—অপেক্ষা কর। দুই বৎসর হইল, তোমার কোষের ঐ অগ্নি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অগ্নির অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ! অগ্নি কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিজ্জাল করিয়া দাও।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময় অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু প্রহরিগণ যখন অগ্নি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে উদ্বেগ সংযম করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নামাইয়া নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রাও জুমলাদার

আমা হইতে অন্ত যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দেহে যেন দেহ,
হৃদি জলে হলাহল।——

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ঘীশক্তি, অসাধারণ বীৰ্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স ষ্ণুনাথ অগেক্ষা ১৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে ৪০ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি গুরু। নয়ন ক্ষুদ্র ও অতিশয় উজ্জল। চন্দ্রাওকে যাহারা বিশেষ কারয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে, চন্দ্রাওয়ের তেজ ও সাহস যেকোন দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শিনী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহনির্মিত, যাহারা চন্দ্রাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বৃদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সে অল্পভাবী স্থিরপ্রতিজ্ঞা জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত

ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিব্যরাত্র জলিত। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাধানে তিনি আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়াহস্তে সেই পথ পরিকার করিতেন। শত্রু হটক, মিত্র হটক, দোষী হটক, নির্দোষী হটক, অপকারী হটক বা পরম উপকারী হটক, সে পথের সন্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাঁহাকে পদদলিত করিয়া নিজ পথ পরিকার করিতেন। অল্প বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সন্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুগলদার পথ পরিকার করিলেন। একরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ববৃত্তান্ত জানা আবশ্যিক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

চন্দ্ররাও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন না। রাজা যশো-বন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকন্তাকে যত্ন করিত, অথবা গজপতির সহিত যুদ্ধে যুদ্ধে ফিরিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র, তখন গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা, হৃদয়মণীয় তেজ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজপুত্র রঘুনাথের জায় চন্দ্ররাওকে তালবাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত

হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ,—যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রানীকৃত হইতেছে, যে স্থানে ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যে স্থানে বিজেতার হুঙ্কারে ও আর্জের আর্জনার্দে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে, তথায় অব্বেগ কর, পঞ্চদশ বর্ষের অন্নভাবী দূঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে তথায় পাইবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত-বাস্ত করিতেছে, হান্ত ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্রাও তথায় নাই। অন্নভাবী দূঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরে অন্ধকারে একাকী বলিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সাংসংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্রাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পশ্চিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুত-শিশু নহেন। তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতিসিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্রাও এক্ষণে একজন অসাধারণ ভেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্রাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্রাও গজপতিকে পরম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। গজপতি যুদ্ধের পর চন্দ্রাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন,—চন্দ্রাও! অজ্ঞ তোমার সাহসেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে; ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?

চন্দ্রাও মুগ্ধ অবনত করিয়া বিনীতভাবে রহিলেন।

গজপতি স্নেহে বলিলেন,—মনে ভাবিয়া দেখ, বাহা ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি, চন্দ্রাও! তোমাকে কিছুই অদেয় নাই।

তখন চন্দ্রাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্তথা করেন না, জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।

সভা'স্থ সকলে নির্ভীক, নিশ্চল। গজপতি'র ম'থায় যেন অ্যাকাশ ভাজিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক নিষ্কাশিত হইল। কিন্তু সেই ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া গজপতি উচ্চৈঃস্বরে ক'রয়া ব'হিলেন,—অঙ্গীকারপালনে বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের মহারাষ্ট্রীয় দম্ভায় সহিত পর্ত্তকন্দর ও অঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভি্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ কর, অঙ্গলকুটারের পরিবর্তে দুর্গ প্রস্তুত কর, দম্ভার পরিবর্তে ঘোড়ার নাম গ্রহণ কর, তৎপরে রাজপুত-দুহিতার বিবাহ কামনা জানাইও। এমন অল্প কোন ব'জ্র আছে ?

চন্দ্রাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—অল্প কোন ব'জ্রা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে, প্রভুকে জানাইব।

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল। উদারচেতা গজপতি চন্দ্রাওয়ের প্রতি ক্রোধ অ'চিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেই দিনকার কথা নীত্ৰ বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্রাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্রাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছে।

ছুই দণ্ডের পর চন্দ্রাও একটি দীপ জ্বালিলেন, একখানি পুস্তকে লঘুত্ব কি কি লিখিলেন। পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্ত মুখমণ্ডলে দেখা গেল। তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—চন্দ্রা ! কি লিখিতেছ ? চন্দ্রাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি, তাহাই লিখিতেছি।

বন্ধু চলিয়া গেল, চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটি খণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাদুর্ঘ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতিসিংহ হত হইলেন, “মাধবীকঙ্কণ” নামক উপত্যাসের পাঠক ভাটা অবগত আছেন।

গজপতির অনাথ বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে পুনরায় মেওয়ার প্রদেশে সূর্য্যমহল নামক দুর্গে বাহিতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নব বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালক-বালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী, রজনীবোণে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও !

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোবধ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে কিছু অর্থ আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতিসিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন, সকলে দেখিতে পাইল। তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ ও জায়গীর দেখিয়া সকলে তাঁহার সমাদর করিলেন। দিনে দিনে চন্দ্ররাওয়ের যশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় কক্ষণে বালক রঘুনাথ তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া পড়িল। জুমলাদার অচিরে পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

लक्ष्मीबाई

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
 স্বামী বনিতার যে বিধাতা ।
 স্বামী বনিতার শন, স্বামী বিনা অন্য জন,
 কেহ নহে সুখ-মোক্ষদাতা ।

युकुन्दराय चक्रवर्ती ।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দম্ভাবেশী চন্দ্রাণ্ড দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। একদিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে বা গৃহস্থের বাটীতে কয়েক দিন লুকাইত থাকেন, স্থানকর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাওয়াজ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতি-
বাহিত করিল। সংসারস্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী
ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পর্যটন করিল, নানা লোকের নিকট
ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব-
গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্রাটের কথা বালকের মনে সর্বদাই
জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও
বলিত না। কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে

প্রান্তরে বা পর্বতশৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে বেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরজাগ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশ পথিকরা পর্বতগুহায় সংগ্রামসিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স, তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের জায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটি সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটি হাবিলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহার কয়েক দিবস পরেই ভোরণহুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমা-দিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম রঘুনাথ সিংহ; কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে হাবিলদারী কার্য্য পাওয়া অবধি সকলে তাঁহাকে রঘুনাথজী হাবিলদার বলিয়া ডাকিত।

রঘুনাথ হাবিলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাজ জুমলাদারের অধীনে একজন হাবিলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ চন্দ্ররাজকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপনার বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, তাঁহাকে দম্ভ বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং

তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বাইলেন। চন্দ্রাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অন্নভাষী জুমলাদারের ললাট অল্প পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্রাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। চন্দ্রাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অল্প রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীভূত হইলেন।

চন্দ্রাওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী বাইলেন। পাঠক! চল, আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সন্দেশে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলে, বহির্দ্বারে নব্বয় বাজিতে লাগিল, অসংখ্য দাসদাসী প্রভুর সম্মুখে আসিল, অনেক প্রতিবেশী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্রাওয়ের আগমনবার্তা সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইল। জুমলাদারের বাটীর অন্তঃপুরে ধূমধাম পড়িয়া গেল, সেই ধূমধামের মধ্যে শাস্ত্রনয়না ক্ষীণাক্ষী লক্ষ্মীবাই নীরবে স্বামীর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শাস্ত্র, ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কণ্ঠা ছিলেন, কিন্তু কোমল-বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অন্নভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃদ্ধ হইতে উৎপাটিত কোমলগুপ্তের জায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে ছুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে?

বালিকা পূর্বকথা শ্রবণ করিত, পিতার কথা শ্রবণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা শ্রবণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সদ্ধৃদয় ও সদয় হন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দয় ও বিষম হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? কিন্তু যদিও চন্দ্রাওয়ের হৃদয়ে অভিমান, জিঘাংসা ও উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিত, তথাপি তিনি অসহায় নারীর প্রতি নির্দয় ছিলেন না। নন্দমুখী, নন্দ-হৃদয়া লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচর্য্যায় চন্দ্রাও তুষ্ট হইতেন; যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে পতিপরায়ণা লক্ষ্মীবাইয়ের নিকটে আসিয়া শান্তিলাভ করিতেন; লক্ষ্মীবাইয়ের নিক্ত রূপ দেখিয়া ও নিক্ত কথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। লক্ষ্মীবাই তখন জগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সামান্য যত্নে তিনি পুলকিত হইতেন, স্বামীর একটি মিষ্ট কথায় তাঁহার হৃদয় প্রাবিত হইত। যে পুষ্পচারাটিকে উদ্ভাবন হইতে আনিয়া গৃহমধ্যে অঙ্ককারে রাখা যায়, সে চারাটি গৃহমধ্যস্থ একটি আলোকরেখার দিকে কত পুলকের সহিত ধায়!

এইরূপে সংসারকার্য ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, বীর শাস্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শাস্ত, নিরুদ্বেগ! লক্ষ্মী পূর্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ, বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই স্মরণের রক্তশূণ্য গণ্ডস্থল

দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

অন্ত চন্দ্ররাত্রে আহাৰে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যঞ্জন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ক্রয়ুগল কি সুন্দর ও সুচিকণ, যেন সেই পরিষ্কার শাস্ত ললাটে তুলি দিয়া অঙ্কিত। শাস্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটিতে যেন চিত্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গওস্থল সুন্দর, সুচিকণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ; সমস্ত শরীর শাস্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রকল্লতা, উন্নততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ণ পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সৌন্দর্য্য ও সুভাগ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে ঈষৎ শুষ্ক। লক্ষ্মীবাইয়ের চাকু নয়ন, সুদীর্ঘ কেশভার, কোমল বাহুব্বর ও কোমল দেহলতার মুক্তার লাবণ্য আছে, কিন্তু হীরকের উজ্জল কিরণ নাই।

একদিন চন্দ্ররাত্রে লক্ষ্মীকে জানাইয়াছিলেন যে, তোমার ভ্রাতা আমার অধীনে হাবিলদার হইয়াছে ও বশোলাভ করিয়াছে। বখাটি সাক্ষ হইলে চন্দ্ররাত্রে ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

আর একদিন স্বামীর ছুই একটি মিষ্টবাক্য প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন,—দাসীর একটি নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।

চন্দ্ররাত্রে শয়ন করিয়া তাহুল চর্চণ করিতেছিলেন, নম্রমুখীকে সম্বোধে চুপন করিয়া বলিলেন,—কি, বল না, তোমার নিকট আমার অদেয় কি আছে?

লক্ষ্মী বলিলেন,—আমার ভ্রাতা বালক, অজ্ঞান।

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী। সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।

চন্দ্ররাও। না। সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন, তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটয়াছে। চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর বৎপরোনাশ্তি জুড়! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,—বালক যদিও দোষ করে, আপনি না মার্জনা করিলে কে করিবে?

চন্দ্ররাওয়ের ললাটে আবার সেই মেঘচ্ছায়া দেখা গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে কথা আর উল্লেখ করিলেন না।

তাহার পর চন্দ্ররাও অস্ত্র প্রথমে বাটী আসিয়াছেন। রঘুনাথের যাহা ঘটয়াছে, লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল। তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন, যেন স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহ্বার সমাপ্ত হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাষুল হস্তে তথায় যাইলেন। দেখিলেন, স্বামীর ললাট চিন্তাকুল। লক্ষ্মী তাষুল দিরা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্কভাবে দ্বার বন্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে চন্দ্ররাও একটি বায়ল বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন, দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন সত্য অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি শ্লোক

কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাতা খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে,—

“মহাজন ... গজপতি ;

ঋণ ... অবমাননা ;

পরিশোধ ... তাঁহার শোণিতে, তাঁহার বংশের অব-
মাননায় ।”

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন, ঈষৎ হাস্য সেই বিকট
মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন,—“অল্প পরিশোধ হইল ।”
তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন ।

দ্বার উদ্বাটন করিয়া লক্ষীকে ডাকিলেন, লক্ষী ভক্তিতাবে স্বামীর
নিকট আসিলেন । চন্দ্রবাও লক্ষীর হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া
বলিলেন,—অনেক দিনের একটি ঋণ অল্প পরিশোধ করিয়াছি ।

লক্ষী শিহরিয়া উঠিলেন ।



ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঈশানী-মন্দিরে

চেরিলা অদূরে

সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।

মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চত্বরগুহের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতিউচ্চ একটি পৰ্ব্বতশৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে ক্ষোদিত ছিল, নীচে একটি পৰ্ব্বত-তরঙ্গিণী কুলু কুলু শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-জলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণপূর্বক ঈশানীর পূজা দিত, অস্ত্র-পৰ্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রিসংখ্যা হাস প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পৰ্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আশ্রিত, চূড়া হইতে নীচে সমতলভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাভাগেও, সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ভীষণ অন্ধকার করিত, সেই অন্ধ্রিষ্ণু ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটারে বাস করিত। সেই পুণ্যময় অন্ধ্রিষ্ণু স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন,

তথ্য শাস্ত্রের ভিন্ন অল্প কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণকথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অল্প কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবন প্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এ ক্ষুদ্র প্রশান্ত পর্বতমন্দির বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকা সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় উদ্বেগশরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্নততার অশ্রাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিবাদে অথ রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ উন্নতপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশ্রয় উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্নততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতে-ছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শাস্ত্র নিশীথে, শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগনমণ্ডলে ধীরে ধীরে উথিত হইতেছিল। সেই পুণ্যকথা শাস্ত্র নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে

লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানব-হৃদয় শান্তিরগে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতি-
ধ্বনিত হইতেছে! সুন্দর বঙ্গদেশে, তুমারপূর্ণ পর্বতবেষ্টিত কান্মীয়ে,
বীরপ্রত্ন রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে, সাগর-প্রফালিত কর্ণাট ও
ড্রাবিড়ে, কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে! যেন
চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত
না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে
প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হুজিরা, অযোধ্যা, মিথিলা, কান্ধী, মগধ,
উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও বশে প্রাবিত করিয়াছিল।
হুর্কিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ
ধর্মরক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামায়ে মুগ্ধ হইয়া
শিবজী পুনরায় প্রাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়া-
ছিলেন। অস্ত্র ক্ষাণ হুর্সল হিন্দুদিগের আত্মার স্বল এই পূর্বগীত-
মাত্র, যেন বিপদে, দিশাদে, হুর্সলতায় আমরা পূর্বকথা বিস্মৃত না হই,
যতদিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়বদ এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে
ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! তুমি ইগিয়দ ও ইগিয়দ-পাঠ করিয়াছ, দাস্তে ও
সেক্সপীয়র, গেটে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরহুগা পাঠ
করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাকুলি সরস-
ভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত,
প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচাৰ্য্যের অপূর্ণ বীরত্বকথা! দুঃখিনী
নীতার অপূর্ণ পতিব্রতা-কথা। এই কথা হিন্দুমাত্রেয়ই হৃদয়ের

স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

পাঠক ! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা অরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা অরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না।

শাস্ত্রকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের উত্তম ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শাস্তি স্বেচন করিতে লাগিল। হস্তভাগার উন্মত্ততা ক্রমে ক্রান্ত পাইল, সেই মহৎকথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল ! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অন্ধে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শাস্ত্র অবসর শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন ! আজি কিসের স্বপ্ন ? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন ? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশো-বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন ? হায় ! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভয় হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকাপূর্ণ সংসারের সেই মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন ? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন ? দুর্গ অয় করিতেছেন ? বোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন ? রঘুনাথের সে উত্তম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উত্তমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাপ্রদীপ নির্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শাস্ত্র বজুহীন যুবকের হৃদয়ে বহুদিনের

কথা পূর্বজীবনের স্বাভাবিক জাগরিত হইতেছে। শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও স্মৃতি আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর সূর্য্যমহলে ক্রীড়া করিতেন, হাশ্বত্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শাস্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল। আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল স্নেহের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন, লক্ষ্মী স্বয়ং লাতার শিরোদেশ আপন অঙ্গে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত লাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরা স্নেহপূর্ণনয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল; যেন শোকে না চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটি সেই নৈশ হির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান।

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন, বলিলেন,—ভগবান, অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ? আমি যেন উন্মত্ত না হই।

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন। এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের

সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্গে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন।

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার বাক্যক্ষুৰ্ণ হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল; অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরুণ যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অশ্রু স্নেহ দূর হউক, অশ্রু আশা দূর হউক, লক্ষ্মী! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।

লক্ষ্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে স্নেহ, জগতে কি রহ আছে, স্বর্গে কি স্নেহ আছে, বাহা অভাগাগণ সে স্নেহের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেককণ বাক্শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, স্নেহের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া জনয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভগিনীর ত্রায় এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে? ভ্রাতৃস্নেহের ত্রায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, পাঠক ক্ষমা কর।

অনেককণ পরে দুই জনের হৃদয় শীতল হইল। তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—ঈশানার ইচ্ছায় কত অসুখকালের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম।

আহা ! আজ আমার কি পরম সুখ, দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল ? তাই, এ শীতল বাতাসে আর থাকিলে ভোগার অসুখ হইবে, চল, মন্দিরের তিতর.যাই, আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না ।

ভাতা-ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আগিলেন, বঙ্গী এৰটি স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রত্ননাথ পূর্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্বকথা কহিতে লাগিলেন ।

ধীরে ধীরে ভাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । রত্ননাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন । দম্পত্যহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন । কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গোবৎস বা মেঘপাল রক্ষা করিতেন, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, বা নির্জনে বসিয়া চারণদিগের গীত গাইতেন । কখন সায়াংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শাস্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যুষে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পূর্বকথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন । পর্বতসঙ্কুল বঙ্গ-প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন দৃষ্টক্ষেত্রে যাইতেন । বয়োবৃদ্ধির সহিত রত্ননাথের যুদ্ধব্যবসায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন । আজ তিন বৎসর হইল, সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন, তিনি কার্য্যে ক্রটি করেন নাই ; কিন্তু এতু শিবজীর অযথা সন্দেহে অপমানিত হইয়া

দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন! এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই, পিতার ভ্রায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অব্যাহত অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের নাম করিলেন না, ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,—মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিকাল পরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র আয়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ভ্রায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরব-জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী স্নেহে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অমুগ্ধ হ করেন, সে অমুগ্ধে দাসী স্নেহে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে স্নেহে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্য মধ্য পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ত কতক চেষ্টা করিতেছেন। অজ্ঞ সেই কামনার মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাইকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের কথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সাস্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ করা, সাস্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করা, এই নারীর ধর্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার মন শাস্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে না। ভগবান্ যে সুখ দেন, তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই, তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব-জন্মই দুঃখময়। যদি আমরা সহ্য না করিব, তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দিন সকলেরই আছে, দুর্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম করিয়া নিজ শোক বিমুত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অল্প কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই! এ নৈরাশ্য দূর কর, একরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহারনির্দ্দা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?

রঘুনাথ। থাকিবার আবশ্যিক কি? যে দিন বিজোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জ্ঞাত?

লক্ষ্মী। তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে, এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। 'তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব, সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই, তুমি জীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা আমাদের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপবন সহস্রগুণে কষ্টকর। সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী। তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমূখ হও ? মহামুভব শিবজীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার অভিমান, পিতার দর্প পুন্নে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে এইরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,—মার্জনা কর, আমি জীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকটে যাইতে অসম্মত হও, কার্য্য ঘাৱা কেন আপন যশ রক্ষা কর না ? পিতা বলিতেন, “দৈন্য সাহস ও প্রভুভক্তি কার্য্যে প্রকাশ হয়।” যদি বিজোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না ?

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে ?

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি, শিবজী দিল্লী বাইতেছেন, তথায় সহস্র খটনা খটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি জীলোক, আমি কি আনি বন ? তোমার পিতার জ্ঞায় সাহস, তাঁহারই জ্ঞায় বীরপ্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে ?

রঘুনাথের যদি অস্ত্র চিন্তার সময় থাকিত, তবে বুঝিতেন, কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানবহৃদয়শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আত্ম রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোকসস্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা

নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—লক্ষ্মী! তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নতুন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে, ভগবান্ সহায় হউন, রঘুনাথ বিজ্রোহী নহে, ভীকু নহে, এ কথা এখনই প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন,—দোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঈষৎ দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না? প্রকাশে বলিলেন,—ভাই! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? কিন্তু যাহাই হউক, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে।

রঘুনাথ। আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—আমার আর একটি কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী। চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয়, তোমার অপকার করিয়াছেন!

রঘুনাথের হাত দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু সে উদ্বেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন,—চন্দ্ররাও রাজার নিকটে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অথ কোন অপকার কহিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না।

লক্ষ্মী। তিনি বাহাই করিয়া থাকেন, তাই, অঙ্গীকার কর, তাঁহার অনিঃ করিবে না।

রঘুনাথ নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন,—ভ্রাতার নিকট পূর্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটি কথা বলিলাম, তাই, আমাকে যদি ভালবাস, এ কথাটি রাখিও।

সে অমুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগিনীর হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মী, আমার মনে মনে সন্দেহ হয়, চন্দ্রাওই আমার সর্বনাশ করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। এই ভৈরবী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চন্দ্রাওয়ের কোন অনিষ্ট করিব না; আমি তাঁহার দোষ মার্জনা করিলাম, জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জনা করুন।

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জনা করুন।

পূর্বদিকে প্রভাতের আলোকচ্ছটা দেখা যাইল, লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সন্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় হইলেন; বলিলেন,—আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক বন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এক্ষণে আমি না যাইলে জানিতে পারিবে, এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,—এই বলিয়া সন্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিজান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক। চল, আমরা হতভাগিনী সরযুর নিকট বিদায় লইয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সীতাপতি গোস্বামী

যাও যুদ্ধে তোমা অস্ত্র করি অভিষেক,

* * *

যাও বশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার

এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের যাইতে কি অস্ত্র বিলম্ব হইয়াছিল, পাঠক মহাশয় অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন । সে দিন যুদ্ধে কে রক্ষা পাইবে, কেহ জানিত না, যুদ্ধে গমন করিবার পূর্বে রঘুনাথ প্রাণ ভরিয়া একবার সরযুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সাক্ষাৎকালে সরযু রঘুনাথকে বিদায় দিয়াছিলেন ।

এক দিন দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না । আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল,—রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী রঘুনাথ শীঘ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে আবার আসিতেছেন, পরম কুতূহলের সহিত লিতার নিকট যুদ্ধকথা কহিবেন । কিন্তু রঘুনাথ আর আসিলেন না, সেদিনকার যুদ্ধকথা বর্ণনা করিলেন না ।

সহসা বজ্রের হ্রাস সংবাদ আসিল, রঘুনাথ বিজোহী, বিজোহাচরণ

অল্প অবমানিত হইয়া দূরীভূত হইয়াছেন ! প্রথম মুহূর্তে সরযু চকিতের ভাষা রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না । ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রক্তিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অধিকণা বহির্গত হইতে লাগিল । দাসীকে বলিলেন,—কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী ? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন ? কিন্তু তুই নির্দোষ, তোকে কি বলিব, সন্দেহ হইতে দূর হ !

ক্রমে বৃদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্ত আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল, “রঘুনাথ বিদ্রোহী !” সরযুর সখাগণ, সরযুকে এই কথা বলিলেন ; বৃদ্ধ অনার্দ্রনও সাশ্রলোচনে বলিতে লাগিলেন,—কে জানে, সেই সুন্দর উদারযুক্তি বালকের মনে একুণ ক্রুরতা ছিল ? সরযু সমস্ত ভুলিলেন, কোন উত্তর করিলেন না । অগৎশুদ্ধ লোকে রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিতেছে, সরযুর হৃদয় কহিল, অগৎ মিথ্যাবাদী, রঘুনাথের চরিত্রে দোষ স্পর্শে না ।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর এদদিন সন্ধ্যার সময় সরযু সরোবর-তীরে যাইলেন । দেখিলেন, সরোবরের কূলে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামী বসিয়া রহিয়াছেন । সরযু দ্রব্য বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, যতই গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল ।

গোস্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন, কণেক স্থিরভাবে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—ভদ্রে ! এ গোস্বামীর নিকট কি তোমার কোনও প্রয়োজন আছে ? কোনও বিশেষ অতীষ্টে আমার নিকট আসিয়াছ ? রমণি ! তোমার ললাটে হৃৎপিণ্ড দেখিতেছি কেন ? চক্ষুতে জল কেন ?

সরযু উত্তর করিতে পারিলেন না। গোস্বামী পুনরায় বলিলেন,—
বোধ হয়, আমি তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছি, বোধ হয়, কোন
বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।

সরযু তখন কম্পিতস্বরে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার শক্তি
অসাধারণ, যদি অমুগ্ৰহ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে বাধিত হই।
সেই বন্ধু বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে
আসিয়াছি।

গোস্বামী। জগতে সকলে তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।

সরযু। প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।

গোস্বামী। মহারাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর
করিয়া দিয়াছেন।

সরযুর মুখ রক্তবর্ণ হইল; আরক্ত নয়নে কহিলেন,—তপস্বী,
প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিশ্বাস করিব না।
গোস্বামিন্! আমি বিদায় হই।

গোস্বামীর নয়ন জলপূর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—
আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে।

সরযু। নিবেদন করুন।

গোস্বামী। মহুয়াহৃদয় অবগত হওয়া মহুয়াগগনার অসাধ্য,
রঘুনাথের হৃদয়ে কি ছিল, জানিবার একমাত্র উপায় আছে। প্রণয়িনীর
হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ
থাকে, তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি, জিজ্ঞাসা
কর, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।

সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—জগদীশ্বর, তোমাকে
ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তিদান করিলে। সেই

উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যতায় তাহার স্থিরবিশ্বাস বিচলিত হইবে না।

কণেক পরে গোস্বামী আবার বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে? আমার নিকট লজ্জার কারণ নাই, আমি সংসারের বহির্ভূত।

সরযু দৈবৎ লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—প্রভুর সহিত তাঁহার সম্মুখিতা সাক্ষাৎ হইরাছিল?

গোস্বামী। কল্য রজনীতে ঈশানী-মন্দিরে সাক্ষাৎ হইরাছিল। তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইরাছেন।

সরযু। তিনি আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়াছেন?

গোস্বামী। নিজ বাহুবলে, নিজ কাৰ্য্যশূণ্যে, অস্ত্রায় অপব্যয় তিরোহিত করিবেন অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।

সরযু। ধন্ত বীর প্রতিজ্ঞা! যদি তাঁহার সহিত পুনরায় আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন, সরযু রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। বলিবেন, সরযু যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে। ভগবান্ অবশ্যই রঘুনাথের যত্ন সকল করিবেন।

গোস্বামী। ভগবান্ তাহাই করুন। কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্বদা জয় হয় না। বিশেষতঃ রঘুনাথ যে দুৰ্দ্ধহ উত্তম প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয়ও আছে।

সরযু। রাজপুতের সেই ধর্ম্ম। আপনি তাঁহাকে জানাইবেন,

যদি কর্তব্যসাধনে তাঁহার প্রাণবিস্রোগ হয়, সরযুবালা তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিবে।

উভয়ে কণেক নিম্নরূপ হইয়া রহিলেন। অনেককণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন ?

গোস্বামী কণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, আপনি কি তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন ? জগৎ যাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন ? ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে কি সরযুবালা মনে রাখিবেন ?

সরযু বলিলেন,—প্রভু ! তাঁহাকে জানাইবেন, সরযু রাজপুত্রবালা, অবিখ্যাসিনী নহে।

গোস্বামী। জগদীশ্বর। তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই। লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন, একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে। এক্ষণে বিদায় দিন। আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে।

সজলনয়নে সরযু বলিলেন,—তাঁহাকে আরও বলিবেন, তিনি অসিহস্তে যশের পথ পবিত্র করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন।

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযু বলিলেন,—প্রভু ! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

গোস্বামী বলিলেন, "সীতাপতি গোস্বামী !"

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল ! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রায়গড় দুর্গ

ধিক্ দেব, ঘৃণাশূন্য অক্ষয় হৃদয়,
এত দিন আছ এই অকৃতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীৰ্য্য, সব তেয়োগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জলি ?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পূৰ্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রাজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, যন্ত্রী, কৰ্মচাৰী, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রী, জীর্ণতম গুরুকেশ বহুদর্শী জায়শাজী, সভাতল সূশোভিত করিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসারে, বুদ্ধিসঞ্চালনে, বা বিজ্ঞাবলে ইঁহাদাই শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর জায় ইঁহাদেরও হৃদয় স্বদেশান্তরাগে পূর্ণ। কিন্তু অত সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাজ্যীয় বীরগণ অস্ত মহারাজ্যীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার অন্ত সমবেত হইয়াছেন।

অনেককণ পর শিবজী যুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—
পেশওয়াজী ! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা
স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জারগীরদার হইয়া থাকিব ?

মুদ্রেশ্বর । মমুষ্যের বাহা সাধ্য, আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন কবিতে পারে ?

শিবজী । স্বর্গদেব ! যখন আপনি আমার আদেশে এই ক্ষুদ্র প্রশস্ত রায়গড়দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী-স্বরূপ নির্মাণ করেন, না জায়গীরদারের অবস্থান বলিয়া নির্মাণ করেন ?

আবাজী স্বর্গদেব ক্ষুদ্রস্বরে উত্তর করিলেন,—কত্মিয়রাজ । ভবানীর আদেশে একদিন স্বাধীনতা আকাজ্জা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয় । দৈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন ।

অন্নজী দস্তও কহিলেন,—যাহা অনিবার্য্য, তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীনগরের কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করুন ।

শিবজী । অন্নজী ! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না । ঐ যে উন্নত পর্কতশ্রেণী চক্ৰালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্যকালে ঐ পর্কতশৃঙ্গ আরোহণ করিতে করিতে বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত ! পুনরায় মহারাত্রীদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, পুনরায় হিন্দুরাজ্য হিমালয় হইতে সাগরকূল পর্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন । দৈশানী ! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নবাত্র, তবে এক্ষণে স্বপ্নে কেন বাগকের হৃদয় চঞ্চল কবিয়াছিলে ?

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরব, সভায় শব্দমাত্র নাই । সেই নিস্তরুতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অক্ষকার স্থান হইতে একটি গজীর স্বর শ্রুত হইল,—দৈশানী প্রবঞ্চনা করেন না ! মমুষ্যের যদি অধ্যবসায় ও বীরত্ব থাকে, দৈশানী সহায়তাদানে কুণ্ঠিত হইবেন না !

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, নবীন গোস্বামী লীতাপতি ।

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল, বলিলেন—গৌসাইজী ! তুমি আমার হৃদয়ে 'বাল্য উৎসাহ' পুনরুদ্ভেক করিতেছ, বাল্যকথা পুনরায় শ্রবণ করাইতেছ ! তাত দাদাজী কানাইদেব যুত্মশয়্যায় শায়িত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'বৎস ! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর নাই । এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, স্বাধীন, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, দৈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর ।' বিংশতি বৎসর পরে অস্ত দাদাজীর গভীরস্বরে আমার কর্ণকুহরে শব্দিত হইতেছে, দাদাজী কি প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ?

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গভীরস্বরে বলিলেন,—কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে । পশ্চিমধ্যে যদি আমরা ভ্রমোৎসাহ হইয়া নিরস্ত হই, সে কি দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীর্ণতা ?

"ভীর্ণতা" শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদ্বিগের কোষে অসি বন্ধ্যনা শব্দ করিল ।

গোস্বামী পুনরায় গভীরস্বরে বলিলেন,—রাজন্ ! গোস্বামীর বাচালতা কমা অত্যন্ত, যদি অস্তায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি, কমা করুন । কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলৌক, ক্ষত্রিয়রাজ, আপন বীরহৃদয়কে বিজ্ঞাসা করুন । যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পরীক্ষিত, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরস্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিবেন ? বালস্বর্ঘ্যের ভ্রাতা যে হিন্দুরাজ্যের জ্যোতিঃ চারিদিকের

অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত হইতেছে, সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্! হিন্দু-গৌরবলক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি যেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।

সভাস্থ সকলে নীরব, শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধ্বংস করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—
“গোস্বামিন্! আপনার সহিত অন্নদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে, আপনি দেব কি মনুষ্য, জানি না, কিন্তু দৈববাণী হইতেও আপনার কথা হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য রাজপুত-সেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে, একরূপ সৈন্ত আমাদের কোথায়?

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ করিয়া দৈবকে সংহার করিয়া, কার্য্য সাধন করুন, ভারতবর্ষে একরূপ হিন্দু নাই যে, আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এমন দেবতা নাই, যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!

শিবজী। যানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণির শ্রোতে দেশ প্রাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?

সীতাপতি। সে পাপে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্ত, স্বধর্ম্মের জন্ত যুদ্ধ করেন, তিনি, না যিনি মুসলমানদিগের অর্পভুক্ত হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, আর এক দণ্ডকাল নীরবে

চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তা-লহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে ? একদণ্ড কাল পর ধীরে ধীরে মস্তক উঠাইয়া গভীরস্বরে বলিলেন,—“সীতাপতি ! অস্ত্র আনিলাম, মহারাষ্ট্রদেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, অশ্রুনাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অস্ত্র একটু কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

“যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা সাধনার্থ অনেক বড়যজ্ঞ, অনেক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। স্নেহগণ আমার সহিত সন্ধিবাক্য রাখে নাই, আমিও তাহাদিগের সহিত সন্ধি রাখি নাই।

“অন্ত হিন্দুধর্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্তিস্বরূপ, সত্যনিষ্ঠ অয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি, শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ। মহামুভব রাজপুত্রের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, শিবজী জীবন থাকিতে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

“ধর্মাত্মা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘সত্য পালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে ?’ সে কথা অত্মাপি আমি বিস্মৃত হই নাই, সে কথা অস্ত্র বিস্মরণ হইবে না।

“সীতাপতি ! চতুর আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী জুর্জব হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু সত্যপরায়ণ অয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।”

সভাসদৃ সকলে নীরব রহিলেন। ক্ষণেক পর অরাজী বলিলেন,—

মহারাজ ! আর একটি কথা আছে, আপনি কি দিল্লী যাওয়া স্থির করিয়াছেন ?

শিবজী । সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাধ্যদান করিয়াছি ।

অন্নজী । মহারাজ ! আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন ? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না ?

শিবজী । অন্নজী ! জয়সিংহ স্বয়ং বাধ্যদান করিয়াছেন যে, দিল্লীগমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না ।

অন্নজী । কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন ?

শিবজী । সন্ধিলজ্বনের ফল আরংজীব অবশ্যই ভোগ করিবেন । দত্তজী ! মহারাজুভূমি বীরপ্ৰসবিনী, আরংজীব একরূপ আচরণ করিলে মহারাজুদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে । পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে ।

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না । ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন,—পেশোয়াজী মুরেশ্বর ! আবাজী স্বর্ণদেব ! অন্নজী দত্ত ! আপনাদিগের ত্রায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল, আপনাদিগের ত্রায় কার্য্যক্ষম ও বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাজুদেশে বিরল । আমার অবর্ত্তমানে মহারাজুদেশ আপনারা তিনজনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ত্রায় সকলে পালন করিবে, এইরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব ।

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন । মালতী তখন বলিলেন,—কব্রিসরাজ ! আমার একটি আবেদন আছে ।

বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অমুখতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন,—মালতী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন,—রাজন! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে যাইতে হইবে। অগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

শিবজী। নবীন গোস্বামিন্! কুশলে তীর্থ যাত্রা করুন। যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব। আপনা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আমি দেখিতে আকাজকা করি না। আপনার মত অন্নবয়সেই এক্লপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রুটস্বরে বলিলেন,—কেবল আর এক জনকে দেখিয়াছিলাম।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ কবির গীত

চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্তি ধরিয়া ।

* * *

অগ্নিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্রিতি-গুণে আঁকিয়া ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক যাত্রা লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন । নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিত মনে এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছেন । দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন ? মুঘলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে ? এখনও কি প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই ? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মনঃস্থান আলোড়িত করিতেছে । যোদ্ধার মুখমণ্ডল ও ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, বিপদকালে ও যুদ্ধকালে কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাক্রান্ত দেখে নাই ।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শত্ৰুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন। রঘুনাথপন্থ ভায়শাজী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভায়শাজী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?

ভায়শাজী। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিবজী। দূরে ঐ বহুবিভীর্ণ প্রাচীরের ভায় কি দেখা যাইতেছে, বলিতে পারেন? আপনি অনভ্যসনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্ত?

ভায়শাজী। মহারাজ! দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথুরায়ের দুর্গ-প্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা রাজ্যাশাসন করিতেন? ভায়শাজী, স্বপ্নের ভায় সে দিন গত হইয়াছে। দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, নীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুম্ভম বসন্তে আবার দেখা যায়। আমাদের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না?

ভায়শাজী। ভগবানের প্রসাদে সকলই হইতে পারে। ভগবান্ করুন, আপনার বাহুবলে যেন আমরা পুনরায় গৌরবলাভ করিতে পারি।

শিবজী। ভায়শাজী! বাল্যকালে কঙ্কণপ্রদেশের কথকদিগের যে কথা শুনিতাম, চাঁদ কবির যে গীত শুনিতাম, তাহা কি আপনার

মনে পড়ে ? ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ ছিল, পতাকা ও তোরণশোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল ! রাজসভায় যোদ্ধবর্গ-বেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যতদূর দেখা যায়, পথে, ঘাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে ও নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে ! বহু বিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, উচ্চানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদসম্মুখে সেনাগণ সমাজ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অশ্ব, হস্তী, রথ, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বাগ্গকর সানন্দে বাজ করিতেছে ! প্রভাতেই সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর স্নান করিয়া বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহম্মদ ঘোরীর দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল। সে কথা কি আপনার মনে পড়ে ?

ভারশাজী । রাজন্ ! চাঁদ কবির কথা মনে আছে, কিন্তু আপনি আর একবার সে কথা বলুন। আপনার মুখে সে কথা বড় মিষ্ট লাগিতেছে।

শিবজী । মুসলমান দূত পৃথুরায়কে বলিল,—মহারাজ ! মহম্মদ ঘোরী আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন, তাহাতে আপনার কি মত ?

মহাহতব পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—যবে সূর্য্যদেব আকাশে অস্ত্র একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অস্ত্র রাজ্যকে স্থান দিবেন !

মুসলমান দূত পুনরায় বলিল,—মহারাজ ! আপনার স্বত্তর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আপনি বুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্র দেখিতে পাইবেন।

পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—স্বত্তর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও

বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি, অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।

অবিলম্বে চৌহান সৈন্ত প্রশস্ত হুর্গ হইতে নিজস্ব হইল, তিরোহীর ঘুঁড়ে যবন ও রাঠোর সৈন্ত পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল, আহত ঘোড়ী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

ব্রহ্মনাথ! সে দিন গিয়াছে, এক্ষণে চাঁদ কবির গীত কে গাইবে, কে শ্রবণ করিবে, তথাপি এ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে, স্বপ্নের ভ্রাম্য নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের গৌরবের দিন এখনও উদ্ভিত হইবে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্য দান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারত-সন্তানকে তিনি এখনও উন্নত করিতে পারেন।



ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রামসিংহ

বাপের সমুদ্র বীর, সমান সমান ।

কান্দীরাম দাস ।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শত্ৰুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমনত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—মহারাজ! জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অত্র একজন গৈনিকের সহিত সত্ৰাট্ট আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছে। উভয়ে ষারে দণ্ডায়মান আছেন।

শিবজী। সাদরে লইয়া আইস।

উগ্রবভাব শত্ৰুজী বলিলেন,—পিতাঃ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন?

শিবজীও আরংজীবকৃত এই অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরেই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্র যুবক পিতার ভ্রাতৃ তেজস্বী ও বীর, পিতার ভ্রাতৃ ধর্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী-প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাক্ষলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীৰ্য্য ও প্রভাপের কথা অনেক

শুনিয়াছিলেন, সাবশ্রম্যনয়নে মহারাজ্জীবী বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সন্মানপূরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন।

কণেক পরে রামসিংহ কহিলেন,—মহারাজকে পূর্বে আমি কখন দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অতঃ আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

শিবজী। আমারও অতঃ পর সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজহানেও বিরল। দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহা অলক্ষণ সন্দেহ নাই।

রামসিংহ। রাজন্! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সত্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?

শিবজী। প্রবেশ সর্ব্বক্ষে আপনি কি পরামর্শ দেন?

অকপট স্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন,—আমার বিবেচনায় এই ক্ষণেই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী হাস্য করিয়া বলিলেন,—সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোন সংবাদ অবিস্তৃত নাই। আমার পক্ষে দিল্লী-প্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।

উদারচেতা রামসিংহ শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্বে বুঝিতে

পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্কতে বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র, পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পরামর্শ কখন ব্যর্থ হয় না।

শিবজী বুঝিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্ত কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন,—হাঁ। আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।

রামসিংহ। আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোন বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।

শিবজী। তাহাতে আপনার মত কি ?

রামসিংহ। পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়। রাজপুত্রের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার বাক্য সাহায্যে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে সাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোন ক্রটি হইবে না।

শিবজীর মন নিকরদেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈশৎ হাসিয়া বলিলেন,—তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব। বিলম্ব করিলে বাঘ উদ্ভূত হইবে। চলুন, এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি।

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট

আপনাদিগের রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়, জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার এইস্থানে নির্মিত। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরালিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মসজিদ ও মিনার, কত তক্ত ও সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পশ্চিমধ্যে লোদীবংশীর সম্রাটদিগের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটি গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। আফগানদিগের গৌরবস্বর্ণ্য যখন অন্তর্মিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হমায়ুনের প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির। তাহার পরে “চৌঘট খা”, অর্থাৎ স্বৈত-প্রস্তর-বিনির্মিত চতুঃষষ্টিভুজ প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন, সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটি প্রাসাদ ও অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক, নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকট

আসিলে রামসিংহ সগর্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—রাজনু! এই যে মন্দির দেখিতেছেন, পিতা ভ্যোতিবগননার্থে ঐ মানমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।

শিবজী। আপনায় পিতা যেরূপ বীর, সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এইরূপ সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল। শুনিয়াছি, পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ইচ্ছা হৃৎকম্প হইল, তিনি অস্থ থামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তার উদয় হইল যে, এমনও স্বাধীন আছি, পরাক্ষণেই বন্দী হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ হৃদয়পরায়ণ ভয়ভিঃের নিবট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল, জরসিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, নিজকোষে “ভদ্রানী” নামক অস্ত্র দিকে দর্শন করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

—

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

দিল্লীনগরী

ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে স্তুতানে
গায়ক । * * *

দ্বারে দ্বারে কোলে মালা গাঁথা ফলফুলে
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতী ;
জনশ্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে ।

মধুসূদন দত্ত ।

দিল্লী অস্ত্র মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং
জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে
জাঁকজমক আশ্রয়, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অস্ত্র শিবজী দরিত্র
মহারাত্রিদেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন,
মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য দেখিলে শিবজী আপন
হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা
বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অস্ত্র প্রচুর জাঁকজমকের
আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে
কুলললনার ছায় অপরূপবেশ ধারণ করিয়াছে !

শিবজী ও রামসিংহ একত্র রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন ।

পথ দিয়া অসংখ্য অস্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাখি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অগুরু ঋণসামগ্রী ও অপরিপূর্ণ গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব; রাজা, মন্ত্রদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ সর্বদা গমনাগমন করিতেছে। অস্বারোহিগণ ভীতবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে যুগ্মিত হইয়া স্তম্ভ নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুঙ্কার শব্দে যেন আরোহীর পদমর্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী একদা নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়!

যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি খেত গম্বুজ - যাইয়া বলিলেন,—ঐ দেখুন, ভূম্মা মস্জীদ। মত্লাট্ শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মস্জীদ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ওনিয়াছি, ওরূপ মস্জীদ জগতে আর নাই।

শিবজী বিশ্বযোৎস্ন-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত মস্জীদেব্র প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর খেত প্রস্তর-বিনিৰ্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে!

এই অপরূপ মস্জীদেব্র সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনিৰ্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে

বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ভ্রাম্য সমারোহপূর্ণ আর একটি স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগলসম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্সবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্সবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের ক্রীড়াশ্রেণী সূর্যালোকে ঝঙ্কঙ্ক করিতেছে, প্রত্যেক ক্রীড়া হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমাৰ্গে উড়িতেছে। দুর্গস্থানে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রাচীর হইতে মসজিদ-প্রাচীর পর্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ। অম্বারোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পরহগণ, বহুলোক-সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সৰ্ব্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতর যাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদশোভায় নয়ন ক্লান্ত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে, ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবর্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে। বিশ্বমোক্ষলোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী বাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিম্বিত হইলেন। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ “কারখানায়” অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; অপূর্ণ স্তবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, মলমল, মসলিন বা ছিট; বহুমূল্য গালিচা, চম্ভাতপ, তাষু বা পর্দা; স্তম্বর পরিবেষ্টিত উকীষ, শাল বা গাভ্রাবরণ; অপক্লপ স্তবর্ণ ও

মণিমাণিক্যের বেগমপরিধেয় অলঙ্কার ; সুন্দর চিত্র, সুন্দরকারকাঁথা, সুন্দর খেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য ; রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা দ্রব্য ;— কত বর্ণনা করিব ! ভারত-বর্ষে যত অপূর্ণ শিল্পকার ছিল, সম্রাট্ আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন ছুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট্ রাজকাঁথার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাস-প্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ণ দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাগী-দিগের যত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া “দেওয়ান খান” নামক উন্নত প্রান্ত রক্তবর্ণ-প্রস্তর-বিনির্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট্ সচরাচর এই স্থানে সভার অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অল্প যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গোপন দেখাইবার চতুর্হই সুন্দর খেত প্রস্তরনির্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং ভগতে অতুল্য “দেওয়ান খান” নামক প্রাসাদে সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে ঘাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রক্ত-মাণিক্য-বিনির্মিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিমাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন। সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মম্বদার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অল্প দিল্লী নগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিঘ্ন আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া

আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আগিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাকে কিরূপে আহ্বান করিলেন ? শিবজী অস্ত্র একজন সামান্য কর্মচারীর ভায়ে নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান ! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরুপায় ! সামান্য রাজকর্মচারীর ভায়ে সম্রাটকে “তসলীম” করিয়া দ্রীতিমত “নজর” দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎসংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমবক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্থতা ।

এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ আরংজীব “নজর” গ্রহণ করিয়া, কোনও বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে “পাঁচহাজারী” অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন । শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি ওষ্ঠের উপর দস্তস্থাপন করিয়া অম্পটম্বরে বলিলেন,—শিবজী পাঁচহাজারী ? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন, শিবজীর অধীনে কত জন পাঁচহাজারী আছে ; দেখিবেন, তাহার দুর্জয় হস্তে অসিধারণ করে না !

আবশ্যকীয় কার্য সম্পাদন হইলে সভাভঙ্গ হইল । সম্রাট্ গাত্রো-
থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ বেত প্রস্তরবিনির্মিত বেগমহলে যাইলেন ।
তখন নদীর স্রোতের ভায়ে দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে
লাগিল । যে যাহার আবাসস্থানে যাইল, সাগরের ভায়ে বিস্তীর্ণ দিল্লী-
নগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল ।

শিবজীর আবাসের অন্তর একটি বাটী নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ঘোষে,

অভিযানে সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে, অস্ত্র সত্রাটের সম্মুখে শিবজী রুঠ হইয়া যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সত্রাট তাহা শুনিয়াছেন। সত্রাট শিবজীকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ব্যাধ বৈষ্ণব সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, ত্রুৎ দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন। শিবজী মনে মনে ভাবিলেন,—এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব? হা সীতাপতি গোস্বামিন্! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কণে শক্তি হইতেছে! আরংজীব! সাবধান, শিবজী এ পর্যন্ত তোমার নিকট সত্যপালন করিয়াছে, তাহার সহিত চতুঃতা করিও না, কেন না, শিবজীও সে বিস্তার শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সময়ানল প্রজ্জ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান-সাম্রাজ্য একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে!



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশীথে আগন্তুক

কে তুমি—বিভূতি-ভূনিত অঙ্গ ।

যধুহৃদন দত্ত ।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাজ্ঞীমেরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিখ্যাত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ভায়শাজী সর্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অহুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়, অহুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ভায়শাজী পণ্ডিতপ্রবর ও বাক্পটুতার অগ্রগণ্য। তিনি শিবজীর আবেদন রাজসদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত-রূপে লিখিত হইল। শিবজী যোগল সৈন্তের সহায়তা করিয়া যে যে

কার্যসাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিলীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে,—আমি যে কার্যসাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা না গ্রহণ করেন, অমুখতি দিলে আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করি, কেন না, হিন্দু-স্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে, আমার সঙ্গিগণ ও আমার সৈন্তগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এ দেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।

রঘুনাথ ঞ্জয়শাহী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাটেরদানে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, সে উত্তরে নানা কথা লিখিত আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাগমনের অমুখতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিস্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। হৃদয় অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে। কখন কখন হুই একজন খেতাব মোগল সদর্পে চলিয়া যাইতেছে। অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্কদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এবং হুই একজন কৃষ্ণবর্ণ কাক্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য, আরব, তাতার ও তুর্ক দেশ হুইতে বণিক বা নসাঁফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি, রাজা বা

মল্লবদার বহুলোক-সমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। সৈনিক পুরুষগণ হাঙ্গকৌতুক করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতেছে, বিক্রেতৃগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন অস্ত্রাস্ত্র সহস্র লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের জায় যাতায়াত করিতেছে।

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকান-দার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কল-রব ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, দুই একটি বাটীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, দূরস্থ খট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটি তারা দেখা দিল, পশ্চিম-দিকে রক্তিমচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্বদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, শাস্ত্র বিস্তীর্ণ দিগন্ত-প্রবাহিনী যমুনানদী সায়ংকালে নিস্তরুতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।

সেই নিস্তরুতায় মধ্যে জুয়া মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উথিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবেয় মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উথিত হইতে লাগিল। শিবজী মুহূর্তের জন্ত শুক হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুন-রায় চাহিলেন, কেবল জুয়া মসজীদেবর খেত-প্রস্তর-বিনির্মিত গম্বুজগুলি সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর দূরে পর্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তরুতায় শুক।

রজনী গম্ভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না, কেন না, অস্ত্র পূর্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল।

বাল্যকালের সুহৃদগ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্ভয়, সাহসী ও উন্নত-চরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী। সেই বীরমাতা শিবজীকে মহারাষ্ট্রের জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বীরকারণ্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন।

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্য্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ, বুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ণ জয়লাভ, দৌর্দণ্ড প্রতাপ, হৃদয়মণীয় উচ্চাভিলাষ! শিবজী বিংশ বৎসর পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি বৎসরই অপূর্ণ বিজয়ে বা অসম-সাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়ামিনী? না, এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে মুসলমানরাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দু রাজচক্রবর্তীর মস্তকের উপর রাজছত্র উন্নত হইবে?

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, একদা সময় এক গ্রহর ব্রজনার ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগরাগণনা হইতে সে শব্দ উথিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর পরিব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিশ্চিন্তায় গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রাত হইল। আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, একদা সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন একটি দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্র-দৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত

আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক-ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রুগুলের উপর নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাভূট, শরীরে বিভূতি, হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা কোন প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সত্ৰাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে ?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—মহারাজের জয় হউক।

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। অগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল, বপদের সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোলামীকে প্রণাম ও সন্মুখে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ জালিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এত দূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন? অস্ত্র নিশীথে গবাক্‌দ্বার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি?

সীতাপতি। মহারাজ। রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল। আপনি যে সচিবপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার তুল্য করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না, আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্যটন করিতে হয়, সেই প্রয়োজনেই যথুৱা

প্রভৃতি তীর্থস্থানদর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি, তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাঁই কি, নিশাই কি ?

শিবজী। তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ দিয়া নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ, প্রকাশ করিয়া বলুন।

সীতাপতি। নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?

শিবজী। কুশলে শারীরিক আছি, শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায় ?

সীতাপতি। প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধি আছে, আপনার শত্রু কোথায় ?

শিবজী ; সর্পের সহিত তেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কণদেশের পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে অষ্টাপি স্বাধীন থাকতে পারিতাম, বল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।

সীতাপতি। প্রভু, আত্মতিরস্কার করিবেন না, মন্থ্যমাত্রেই ভ্রাস্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষমাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, সদাচরণ প্রদর্শন করিয়া এ স্থানে আসিয়াছেন, যিনি অসদাচরণে ও কপটচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহাকেই দণ্ড দিবেন। প্রভু ! বলতার জয় নাই, অস্ত আরং-জীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সর্বশেষ নিধন হইবেন। মহারাজ ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাজ্জাদেশে সে কথা এখনও কেহ বিশ্বস্ত হয় নাই; আরংজীব যদি কপটচরণ করেন, তবে মহারাজ্জাদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন, সীতাপতি ! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরাংজীব দেখিবেন, মহারাত্রী-জীবন লোপ পায় নাই। কিন্তু হায় ! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্তেরা যোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দিরূপ থাকিব ?

সীতাপতি । যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরাংজীব জালমধ্যে বদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীরमध्ये বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্বে নহে।

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে বোধ করি, আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এক্ষণে গুপ্তভাবে অস্ত্র রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।

সীতাপতি । প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এক্ষণে সজ্ঞাবনা নাই।

শিবজী । সে উপায় কি ?

সীতাপতি । অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন, দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্বদিকে এক স্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারা য় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আট জন মাল্লা আছে, নিম্নমধ্যে মথুরায় পৌছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাভ্যা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিবজী । আমি আপনার উদ্ভোগে তুষ্ট হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু, তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু প্রাচীর

উল্লেখ্যনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আরংজীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চয়।

সীতাপতি। পাটীলের যে স্থানে লৌহশনাকী দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুকায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী। ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?

সীতাপতি। অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকাবাহক আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তুণ পরিপূর্ণ। সহগা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। মথুরা পৌহিয়া যদি প্রকৃত বন্দু না পাই?

সীতাপতি। আপনার পেশোয়ার ভগিনীপতি মথুরাস আছেন, তিনি আপনার চিরপরিচিত ও বিশ্বস্ত, তাহা আপনি জানেন। আমি অস্ত্র তাঁহার নিকট হইতে আনিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।

বজ্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সীতাপতি শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ভ্রমৎ হস্ত করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—আপনি পাঠ করিয়া শুনান।

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্বরণ হইল যে, শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্রপাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লেখা আছে।

শিবজী বলিলেন,—গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে

অতিবাহিত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইনে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ও প্রিয়মুহুদ্ তন্নজী মালত্ৰী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্তগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?

সীতাপতি। আপনার পুত্র, প্রিয়মুহুদ্ ও মন্ত্রিবর আপনার সহিত অস্ত্র রজনীতে যাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী। সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

সীতাপতি। যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্রসেনা আপনার নিরাপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জন না করিবে?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহামুভব ধীরে ধীরে বলিলেন,—গোদামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাহিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, একরূপ ভীকৃত্যের কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অস্ত্র উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।

সীতাপতি। অস্ত্র উপায় নাই।

শিবজী। তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাজুথ হয় নাই।

সীতাপতি। সময় নাই। অল্প রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।

শিবজী। আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থই হয়, তথাপি শিবজীর অল্প উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিভ্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ কল্লিয়ের ধর্ম নহে।

সীতাপতি। প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষান্ত্রয়ের ধর্ম, আরংজাবকে শাস্তিদান করুন। সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের জায় সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত করুন। অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে নগ্ন হইবে!

শিবজী। সীতাপতি! যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বলিষ্ঠ নাই। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।

সীতাপতি। প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্য আপনি বন্দী।

শিবজী। তাহাই হউক। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না। শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নমনে জলবিন্দু। তখন সন্মুখে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না। আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না। রাগগড়ে আপনার বীর পরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার

এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন, আপনার পরামর্শে শীঘ্র সকলেরই উদ্ধারসাধন করিব।

সীতাপতি। প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম, জগদীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অস্ত্র অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্যো যাঁহাতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।

শিবজী। এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না, সীতাপতি। এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ।

শিবজী। ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্য ধারণ করিয়াছেন?

সীতাপতি। করিয়া বনিলেন,—আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা—যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছি, বিধির নির্মূলে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গলখণ্ডনার্থ ব্রত ধারণ করিয়াছি।

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গলখণ্ডনার্থ এ বিষম ব্রত ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কাব্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটি জানিতে পারিলাম, জৈশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব, যদি অকৃতার্থ হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার পূজার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। গীতাপতি। বাহা বলিলেন, যথার্থ। বাহার অত্ন প্রাণপণ করি, বাহার অত্ন আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্শ্বভেদী দুঃখ আর নাই।

গীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন

শিবজী। জগদীশ্বর আমাকে মার্জনা করুন, আমি একজন নির্দোষ বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

গীতাপতি। সে হতভাগার নাম কি?

শিবজী বলিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার।

ঘরে দীপ সহসা নিৰ্ভাণ হইল। শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় গীতাপতি বলিলেন,—দীপ অনাবশ্যক, বন্ধন, প্রবণ করিতেছি।

শিবজী। আর কি বলিব। তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। গীতাপতি। আপনারই জ্ঞান তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনার অপেক্ষা অল্প, আপনার জ্ঞান তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার জ্ঞানই দুর্দমনীয় বীরত্ব ও শাহস সর্দদা রিগাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি, আপনার পদ্বিকার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্দদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।

গীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেইদিন

প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম, সে দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্বদা আমার ছায়ায় ভ্রায় নিকটে থাকিত, বুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেবা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি।

সীতাপতি। তাহার পর ?

শিবজী। সেই বালক এক বুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর এক বুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, অনেক বুদ্ধ সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।

সীতাপতি। তাহার পর ?

শিবজী। আর জিজ্ঞাসা করেন কি অন্ত ? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরনিবাসী অমুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম। শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই, যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।

শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন,—তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি ? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম

শিবজী। দোষী ? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষেণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অসুসঙ্গীন করিয়া জানিয়াছেন যে,

তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ বৃদ্ধপূর্বে আশীর্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই অন্তর্ভুক্তই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দিষ্টকালে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি, সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধ সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাবুশক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেককণ নীরব হইয়া রহিলেন। অনেককণ পরে ডাকিলেন,—
সীতাপতি।

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জালিলেন; দেখিলেন, সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

আরংজীব

সৰ্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূৰ্খ ।

বল্লভ কথা বুঝিস্ নাহি এই বড় দুঃখ ॥

কুন্তিবাস ওয়া ।

পরদিন প্রায় একপ্রহর বেলার সময় শিবজীর নিজাভঙ্গ হইল । তিনি আগ্রিত হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনিলেন । উঠিয়া গবাক দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে চকিত ও ভুজিত হইলেন ।

দেখিলেন, বাটার পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে ও সমুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বিশেষ পরিচয় না পাইলে প্রহরিগণ বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে বাইতে দিতেছে না । দেখিয়া সীতাপতির কথা শ্রবণ হইল,—কল্যা শিবজী পলাইতে পারিতেন, অস্ত্র তিনি আরংজীবের বন্দী ।

তখন শিবজী বিশেষ অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন । জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্ভেদ হইয়াছিল এবং সেই সন্দেহ প্রযুক্ত সম্রাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, শিবজীর বাটার

চতুর্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাপতি গোস্বামী আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং রত্নী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। শিবজী মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। সত্রাট প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূরক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন, শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন সর্প গো-মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্বে যেক্রপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যর চতুর্দিকে জড়াইয়া ওড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ক্রমে চুষিতে চুষিতে ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, তুর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে ধীরে ধীরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্তমান সমুদায় ঘটনা মূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে গর্জিয়া উঠিলেন। দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্ধক্ষুণ্টক্রে বলিলেন,—আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না, চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিষ্ণায় বালক নহে। এই ঋণ একদিন পরিশোধ করিব, সে দিন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবজী বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ভ্রাম্যশাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, নিঃশব্দে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শিবজী বলিলেন,—পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন, এই খেলা আমাদের খেলিতে হইবে, আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিস্রব নহে। অল্প আমরা বন্দী হইব, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম! কিন্তু অমুচর-বর্গকে পূর্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

ভ্রাম্যশাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপনার অমুচর-দিগের স্বদেশগমনের জন্ত সত্রাটের নিকট অমুমতি প্রার্থনা করুন। এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছে, আপনার অমুচরসংখ্যা ষত হ্রাস হয়, তাহাতে সত্রাট আফ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি, অমুমতি চাহিলেই পাইবেন।

শিবজী। মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয়, ধূর্ত আংজীব এ বিষয়ে আপত্তি করিবে না।

সেই মর্মে একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল। শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, শিবজীর অমুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সত্রাট আফ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের বাইবার জন্ত এক একখানি অমুমতিপত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অমুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—মুখ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অমুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অমুমতিপত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক, অমুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাউক, শিবজী আপনার জন্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম।

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে
জাতীগণকে পরাস্ত করিয়া, বুদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, দিল্লীর ময়ূর-
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত
সমস্ত আর্ষাভ্যর্থের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয়পূর্ব্বক
সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি
অসামান্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর সূচতুর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন,
চল, একবার সেই কপটাচারী, অদূরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদান্তরে
প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব “গোমলখানা” নামক একটি
ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেট মন্ত্রীদিগের সহিত শুণ্ড পরামর্শের
স্থল, কিন্তু অল্প আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন।
কখন তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা বাইতেছে, কখন বা
উজ্জল নয়নে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে,
কখন বা মন্ত্রণা-সফলতাজনিত সন্তোষে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্তরেখায়
অঙ্কিত হইতেছে। সন্ধ্যাট কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত
হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দু-
ধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও
পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে
মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সন্ধ্যাটের কি চিন্তা, তাঁহার সভার
মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও মন্ত্রীকে সন্ধিক্ষণনা আরংজীব
কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, মনের ভাব বলিতেন না। নিজের
বুদ্ধিপ্রার্থ্যে সকলকে পুত্তলিকার ত্রায় চাপাইবেন, সমগ্র দেশ
সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাহ্যিক যেক্রপ
নিজের মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, নিশ্চয় চাহেন না,

কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তসলীম করিয়া বলিল,—সম্রাটের জয় হউক ! জইপনা ! দানেশমন্দ নামক আপনার সভাসদ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, স্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। সম্রাট দানেশমন্দকে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি লম্বাট হইতে অপসৃত করিলেন, মুখে সুন্দর হাস্য ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ আরংজীবের যন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না। তবে তিনি পারস্ত ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, স্মরণ্য সম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন, এমন কি, আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হন, দানেশমন্দ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবংবিধ পরামর্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হইত না, আরংজীব তাঁহাকে অন্নবৃদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি তাঁহার বিজ্ঞা, ধন ও পদমর্য্যাদার জ্ঞান সম্যক্ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

দানেশমন্দ। এ সময়ে জইপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা, কেন না, এ সময় সম্রাট রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত। পারস্ত-কবি সুন্দর লিখিয়াছেন, ‘সূর্য্যের দিকে অগন্তের সকল প্রাণী সকল সময়ে।’

চাহিয়া দেখে, স্বর্ঘ্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণদানে বিরত হয়েন ?’

সম্রাট্ সহাস্ত বদনে বলিলেন,—দানেশমন্দ ! অস্ত্রের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্বসময়েই সমাদরের পাত্র ।

ক্ষণেক এইরূপ মিষ্টালাপ হইলে পর দানেশমন্দ অত্র কথা আনিলেন ; বলিলেন,—অহাঁপনা ! “আলমগীর” নাম সার্থক করিবেন । সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য অয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই ।

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—কেন, সে বিষয়ে আমার কি উত্তোগ দেখিলেন ?

দানেশমন্দ । দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে ।

আরংজীব । শিবজীর কথা বলিতেছেন ? হাঁ, ইন্দুর কলে পড়িয়াছে ।

তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন,—দানেশমন্দ ! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য । শিবজী মৃত ও বিজ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে, তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম, রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ স্বর্ঘ্য যে, রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল । আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অত্র শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিবেদন করিয়াছিলাম । এখন শুনিতেছি যে, দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সম্মানী ও বিজ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্তই কোতোয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি, কয়েক দিন পর সম্মান পূর্বক বিদায় দিব ।

দানেশমন্দ । সত্ৰাটের এ আদেশ শুনিয়া আক্লান্নিত হইলাম ।

আরংজীব । কেন ?

উদারচেতা দানেশমন্দ বলিলেন,—সত্ৰাটকে পরামর্শ দিই। আমার কি সাধ্য, বিস্ত্র জহাঁপনা ! যদি শিবজীর প্রতি দয়াশু আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্ত বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দলোকে নানারূপ অত্যাতি করিত, বলিত যে, শিবজীকে আহ্বান করিয়া রুদ্ধ করা ভায়সঙ্গত নয় ।

আরংজীব ঈষৎ কোপ সজোপন করিয়া সেইরূপ হাঙ্গবদনে বলিলেন,—দানেশমন্দ ! মন্দলোকে কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্ত তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাহাকে সম্মান বিদায় দিব ।

দানেশমন্দ । একরূপ সদাচরণেই জহাঁপনার প্রপিতামহ আকবরশাহ দেশ-শাসন করিয়াছিলেন, একরূপ সদাচরণে আপনারও অ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে ।

আরংজীব । সে কিরূপ ?

দানেশমন্দ । সত্ৰাটের অগোচর কিছুই নাই । দেখুন, আকবর-শাহ বখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুসঙ্কুল ছিল, রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে সর্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূত্র ছিল না । তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্বিরোধ হইয়াছিল, যাহারা পূর্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে । জয়লাভন কিরূপে হইয়াছিল ? কেবল বাহুবলে ? কেবল সাহসে ?

তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই, তবে আর কেহ একরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্ত ? না জহাঁপনা ! কেবল সদাচরণেই একরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবস্থিৎ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত। মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান-সাম্রাজ্যের শুভস্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইরা যায়, অধম কাফেরের প্রতিও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে তাহার ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়, মানবের এই প্রকৃতি, শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জহাঁপনা। তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি ষত দিন জীবিত থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল-সাম্রাজ্যের শুভস্বরূপ থাকিবেন।

দানেশমন্দ কি জন্ত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ হয় এতকণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্যাজ্জই লজ্জিত হইয়াছিলেন। দানেশমন্দকে সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাজ্বলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি শুভ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে বাইতে দেন, দানেশমন্দ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ জানিতেন না যে, হস্ত দ্বারা প্রকাণ্ড ছুরকে বিচলিত করা সম্ভব, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজীবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাস্তলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্দোষের কথার ছায় বোধ হইল। তিনি দৈব

হাত্ত করিয়া বলিলেন,—হাঁ, দানেশমন্দ যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানবহৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবে, রাজস্থানে ত বিজোহিগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্বেই করিয়াছে। কাস্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্বক আহ্বান করিব। এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগলসাম্রাজ্য জন্মের ও মৃদুত্বরূপে স্থাপিত হইবে।

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, —সম্রাটের পিতা দাসকে অমুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও যথেষ্ট অমুগ্রহ করেন, সেই জন্ত কখন কখন মনের কথা বলি, নচেৎ জহাঁপনাকে পরামর্শ দিই, এরূপ বিস্তারিত নাই।

আরংজীব দানেশমন্দকে নিকোঁধ সরল ব্যক্তি জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্ত তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—দানেশমন্দ! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুজ্জিয়ান্ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্যসম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যশাসনকার্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কি জন্ত ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যকালাবধি নিজ অগ্নির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অগ্নি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অগ্নি দ্বারা দেশশাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

দানেশমন্ড। জহাঁপনা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য-শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে, কি সর্বসময়ে আপনি বর্তমান থাকিতে পারেন? অত্র কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

আরংজীব। অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের জ্ঞান থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে! অত্র আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে। অত্র যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে! এই অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অন্তে স্তম্ভ না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্ড! তুমি যখন অশ্ব আরোহণ কর, অশ্বকে বলুগা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যে দিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা স্তম্ভ করিও না। সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।

দানেশমন্ড। প্রভু! যদ্ব্য ত আর অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।

আরংজীব। যদ্ব্য অশ্ব নহে, তাহা জানি, সেই জন্তই অশ্বকে বলুগা দ্বারা চালাই, যদ্ব্যকে উন্নতির আশা ও শান্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে, তাহাকে পুরস্কার দিব; যে অধম কার্য্য করিবে, তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শান্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, যত্ননা আরংজীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহবলে স্তম্ভ রাখিবে।

দানেশমন্ড। প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শান্তি-ভর ভিন্ন মনুষ্য-দ্বয়ে ত অল্প ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সন্মানজ্ঞান আছে! যে শান্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরন্ত থাকে, কিন্তু যাহাকে আপনি সন্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকারণ্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।

আরংজীব। দানেশমন্ড! আমি তোমার ঋণ শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় বাহা লিখে, তাহা বিশ্বাস করি না। মানব-প্রকৃতি আমার শাস্ত্র। মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি, সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি। সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিব, বিজ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর, গলবন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একাকী শাসন করিব। কাহারও সহায়তা লইব না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি মনের গভীর অতীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অল্প কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। এতদ্বিধি তিনি দানেশ-মন্ডের উদার চরিত্র জানিতেন, তাহার নিকট ছুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

কণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—সরলস্বভাব বন্ধু! অল্প আমার অতীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?

ভীক্ষুবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া

সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান-সাম্রাজ্য বোধ হয়, এত শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল,—রামসিংহ জহাঁপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সম্রাট আদেশ করিলেন,—আসিতে দাও।

কণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহ। সম্রাটকে এক্ষণে সময় সাক্ষাৎ করা যাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিদেয়; কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।

আরংজীব। আপনার পিতার নিকট হইতে আমরায় অল্প পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত অবগত আছি।

রামসিংহ। তবে সম্রাট অবগত আছেন যে, পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদের বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্তের অল্পতাবশতঃ সে নগর এ পর্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ গঙ্গখন্দের খুলতান বিজয়পুরের সাহায্যার্থে নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্ত সমেত প্রেরণ করিয়াছেন।

আরংজীব। সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রামসিংহ। চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এবুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক সৈন্তের অল্প প্রার্থনা করিয়াছেন।

আরংজীব। আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য, তিনি নিজের সৈন্তে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না ?

রামসিংহ। মহুঘোর বাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন। শিবজী পূর্বে পরাস্ত হন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন; এখন আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্ত-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলে সমস্ত কার্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে যোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

এরূপ অবস্থায় অত্র কোন সম্রাট সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশ-বিজয়কার্য সাধন করিতেন। আবংজীব আপনাকে বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না। বলিলেন,—রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের গুরুদেব, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাবুত হইলাম। তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।

রামসিংহ কাতর স্বরে বলিলেন,—অইপনা! পিতা দিল্লীখবরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্যক যুদ্ধে যুঝিয়াছেন, অনেক কার্যসাধন করিয়াছেন, দিল্লীখবরের কার্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অস্ত্র উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্যদান না করিলে তিনি বোধ হয়, সঠৈস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন।

বালক জানিত না যে, তাহার কাতরস্বরে ও অশ্রুজলে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, গূঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না! সে উদ্দেশ্য, সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী, প্রতাপাধিত সেনাপতি,

তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশ, অনন্ত প্রতাপ। আজীবন তিনি নিঃকলঙ্কে দিল্লীখবের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন সেনাপতির বিষয়ে নহে, সম্রাট জয়সিংহকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হইলেন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্তে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট হইলেন, দিল্লীখবের হৃদয়ের একটি কণ্টকোদ্ধার হইবে। উর্দুনাভের জালের ভ্রাম্য আরংজীবের উদ্দেশ্য-গুলি বহু বিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অতঃ জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীখবের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে জন্য কি সুন্দর মন্ত্রণাভাল অস্ত্র ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচিত্ত পুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া, মায়া প্রভৃতি স্নকুমার মনোবৃত্তিসমূহে আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়েও স্থান দিতেন না। আত্মপথপরিকারার্থ অস্ত্র একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলিলেন, কল্যা একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উত্তম কার্য্য একইরূপ ধীর নিরুবেগ হৃদয়ে করিতেন। একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতি-পথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মারাবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা

জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। জ্ঞানদা!
তাহাকে সরাইয়া সত্ৰাট আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অল্প আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্তে হত হইবেন।
তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অমুগন্ধানে আবশ্যক নাই,
তিনি সসৈন্তে মরবেন। এই পরিচ্ছেদ বিবৃত সময়ের পর কয়েক মাসের
মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত অকৃতার্থ জয়সিংহ
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখনকার ইতিহাস-লেখক কেহ কেহ সন্দেহ
করিয়াছেন, সত্ৰাটের আদেশে বিষপ্রয়োগে জয়সিংহের মৃত্যু হয়।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন,—প্রভু!
আমার একটি যাচুণা আছে।

আরংজীব। নিবেদন করুন।

রামসিংহ। শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে
বাক্যদান করিয়াছিলেন যে, দিল্লীতে শিবজীর কোন আপদ ঘটবে না।

আরংজীব। আপনাদি পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।

রামসিংহ। রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন
হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা
যে, শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, প্রভু ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে
বিদায় দিন।

আরংজীব ক্রোধ সঞ্চরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—সত্ৰাটের
যাহা উচিত কার্য্য, সত্ৰাট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত
হইবেন না।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কীট সত্ৰাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাক্ষালে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, দানেশমন ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে
পারিলেন না।

জয়সিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই দোষ। শিবজীও সন্ধি-স্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা। আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা প্রদত্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

মাহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জলিত করিল, যোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়া

দূরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লী-নগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহহীন, অস্ত্র যেরূপ রোগবৃদ্ধি হইয়াছে, কল্যাণ পর্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে, শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিত। অস্বারোহী নৈনিক ও সেনাপতিগণ কণেক অশ্ব খামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। শিবিকারোহী রাজা বা মন্সবদার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্যাণ পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্বসময়ে আলোচন করিত। আরংজীব সূর্য্যদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল, তাহা পূর্য্যমত রাখিতেন।

লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, একুশ সময়ে একজন প্রাচীন সম্রাট মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন? হাকিম উত্তর করিলেন,—সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি। সম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যাশয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে, সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ দিসপ্রদোষের ভয় সম্রাট্‌এ কাণ্ড করিতেছেন! তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও, হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে। আমি হিন্দু অতরুণ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।

ভৃত্য এই আদেশ লইয়া দর হইতে বহির্গত হইবার পূর্বেই হাকিম অনাহুত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সম্বোধন করিয়া তিনি অতি স্নেহ সহস্রের হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন ও শয্যাগার্ষে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে হাকিমের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে; অতি শুক্ল শরীর লব্ধিত হইয়া উগ্রস্থল আবৃত্ত করিয়াছে, মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উল্লীয়া, হাকিমের সর দীর্ঘ ও গভীর।

হাকিম বলিলেন,—মহারাষ্ট্র ! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তুনিরাহি, আপনি আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম, আমি স্বার্থসাধন করিব।

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। আপনার পীড়া কি?

কাতর স্বরে শিবজী বলিলেন,—জানি না, এ কি ভীষণ পীড়া! শরীর সর্বদাই অগ্নিবৎ অলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্বস্থানে বেদনা।

হাকিম গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—পীড়া অপেক্ষা জিহাংসায় শরীর অধিক জলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসজ্জাত। আপনার কি সেই পীড়া?

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপক্লেশ হাকিমের দিকে চাহিলেন। যুধ সেইরূপ গম্ভীর, কোন ভাব-বৈলক্ষ্য লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরন্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন। শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেককাল অতিশয় মনোনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—আপনার বচন বেরূপ ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেটীগুলি পূর্ববৎ দৃঢ়বহু। আপনার এ সমস্ত কি প্রবন্ধনাযাত্র?

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের যুগ্মশূল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোন কপট ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—

আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অত্ৰাত্ৰ চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন। এ মহৎ পীড়া বাহুলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।

হাকিম কণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“আলফ্‌লায়সা ও লাম্বুন” নামক আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহুলক্ষণশূন্য পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। একটির চিকিৎসা “বকুসূতনে আসিরী ইশারৎ বর্দ্দ।” কয়েদিগণ কাজ না করিবার জন্য পীড়ার ভাগ করে, তাহার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আর একটি পীড়ার নাম “দিগরান্ দোজখ্‌ এখ্‌তিয়ার কুনন্‌।” বুঝকগণ এই পীড়ার ভাগ করিয়া নরক-পথগামী হয়, তাহার ঔষধি পাছুকা-প্রহার। তৃতীয় এক প্রকার বাহুলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, তাহার নাম “আয়েবহা বরগেফ্‌তা জেরেবগল।” প্রবন্ধকগণ নিজ প্রবঞ্চনা গোপনার্থ এই পীড়া ভাগ করে। তাহারও ঔষধি-নির্দেশ আছে, আমি সেই ঔষধি আপনাকে দিতেছি।

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রবর্ণা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাবিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর্দ, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিবর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভিজ্ঞাঙ্গা করিলেন,—সে ঔষধি কি।

হাকিম উত্তর করিলেন,—সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকৃষ্ট বিষও বটে। “রক্বুল আলমিনার” নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয়, অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে ঘেদবিন্দু পড়িতে লাগিল।

ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রভাৱণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু।

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, শিবজী বলিলেন,—মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।

শিবজী সজ্ঞারে হস্ত-সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম কিছুমাত্র ক্রুণ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন,—এরূপ সজ্ঞারে হস্ত-সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।

শিবজী অনেকক্ষণ অতিকটে ক্রোধ সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, সহসা উঠিয়া বসিলেন,—“রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি” এই বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের গুরু শ্রুত সজ্ঞারে আকর্ষণ করিলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্রুত সমস্ত বলিয়া আসিল, চপেটাঘাতে উক্ষীৰ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্যশুহৃৎ তন্নজী মাতঙ্গী হিন্ হিন্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন।

তন্নজী অনেকক্ষণ পরে হাস্য সঞ্চরণ করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—প্রভু কি সৰ্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে। বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে।

শিবজী সহাস্তে বলিলেন,—বন্ধু, ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আশ্লাদিত হইলাম, বলিতে পারি না, এ কম দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম। এখন সংবাদ কি বল।

তন্নজী। প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে

নিবেদন করিতেছি। সম্রাট যে অমৃত-পত্র দিয়াছিলেন, তদ্বারা আপনার অমৃতবর্গ সকলেই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে।

শিবজী। সে জন্ত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্ত তত ভাবি না। গগনবিহারী পক্ষী সামান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না।

তন্নজী। সেই সমস্ত অমৃত দিল্লী হইতে নিষ্কাশিত হইয়া গোস্থায়ীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও কুন্দাবনে অবস্থিত করিতেছে, মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও করিয়াছি।

শিবজী। চিরবন্ধু! তুমি যেক্রপ কার্য্যদক্ষ, অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারিব।

তন্নজী। দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেক্রপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও রাখিয়াছি। যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা; শুনিয়াছি, স্বয়ং সত্যটের নিকট যাইয়া আপনার জন্ত সাহায্যনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।

শিবজী। সম্রাট কি বলিলেন?

তন্নজী। বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্তব্য, তাহা করিবেন।

শিবজী। বিশ্বাসঘাতক! কপটাচারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।

তন্নজী। রামসিংহ সে বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোবে আমার নিকট বলিলেন যে, রাজপুত্রের বাক্য অগ্রথা হয় না। অর্থ দ্বারা, সৈন্য দ্বারা যেক্রমে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায়, তাহাতে স্বীকৃত আছেন

শিবজী। পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহি না। আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?

তন্নজী। জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় গম্ভীৰ হইলেন এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। এতদ্ভিন্ন দানেশমন্ড প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভা-সদকে মিষ্ট কথায় বা অর্থ দ্বারা আপনার পক্ষবর্তী করিয়াছি। দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান, এক্রপ বড়লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্তী নহেন। কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ করেন না।

শিবজী। তবে সমস্ত প্রস্তুত? আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারি?

সহাস্ত্রে তন্নজী বলিলেন,—আমার শ্রাম বিহ্ব হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের অগ্রত সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?

শিবজী আর এক পাত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তন্নজী সেই

পাখি লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন, শিবজী তাহা পান করিয়া সহ্যশ্রে বলিলেন,—চিকিৎসক ! আগনার ঔষধি যেক্রপ মিষ্ট, সেইক্রপ ফলদায়ী । আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে ।

শিবজীকে সম্মেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীয় ও শ্লগ্ন ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—পীড়া কিরূপ দেখিলেন ?

হাকিম উত্তর করিলেন,—পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে । বোধ করি, অন্নদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন ।

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন । একজন প্রহরী অত্রকে বলিল,—হাকিম বড় ভাল, এত বৈজ্ঞে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিলেন কিরূপে ?

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল,—হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম ।



অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য

এত শুনি উত্তর কণেক শুরু হয়ে ।

কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥

হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার ।

অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥

কাশীরাম দাস ।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে । নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল, সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল । হিন্দুমাঝেই এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিল, ২৬দাশয় মুসলমানগণ সেই সংবাদ পাইয়া স্তবী হইলেন । পথে, ঘাটে, দোকানে, মসজীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল । আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল । শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন । বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়-লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন । পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট ভেট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি মসজীদে ও ফকীরগণের

সেবার্ণ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্ত সকলেই শিবজীর এই বদান্ততা ও সনাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। “দিল্লীকা লাভ্যুর” ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ পস্তিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু আরঞ্জীর অতি নীঘ্রই পস্তিয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আখার সমস্ত নিম্নাং করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আখার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, খাট কি দশ জন লোক বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরণ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আখার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—এ কাহার বাটীতে যাইবে? বাহকেরা উত্তর করিল—রাজা জয়সিংহ-সদনে।

প্রহরীগণ। তোমাদের প্রভু আর কতদিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?

বাহকেরা। এই অগ্নিই শেষ।

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া বাহকেরা একটি অতি সজোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটি আখার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাতিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু বহিয়া গহিয়া বহিয়া যাইতেছে। বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি প্রাণের তটতে শিবজী, অপরটি হইতে শতুজী বাহির হইলেন। উভয়ে জগদ্ব্যবসকে যত্নবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাত্তিমুখে যাইলেন।

সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে এ বিপদ কিছু নূতন নহে, তথাপি তাঁহারও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন। একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—কে যায় ?

শিবজী উত্তর করিলেন,—গোস্বামী। হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রামেব কেবলম্।

প্রহরী। কোথায় যাইতেছ ?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ম্যাদি ছিল। অনেক ধনাঢ্য উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী স্বরাস পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেই দিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাই অশ্বরক্ষক ! তোমার নাম কি ?

রক্ষক। জানকীনাথ।

শিবজী। কোথায় যাইবে ?

রক্ষক। মথুরা।

শিবজী বলিলেন,—হাঁ, এই অশ্ব বটে। শিবজী অশ্ব আয়োজন করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদত্বজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে পল্লী বা গ্রামের দিয়া নির্ঝাঁকু হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিটমিট করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণ-কলেবরা যমুনা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ-ঘাট বর্ধমান বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণহৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পুনর্বৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহা-দিগের কোষে অসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে উদ্বেগে হুক হুক করিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে যার ?

শিবজী। গোস্বামী।

অশ্বারোহী। কোথা হইতে আসিতেছ ?

শিবজী। দিল্লীনগরী হইতে।

অশ্বারোহী। আমরা দিল্লীনগরী যাইব, কিন্তু পথ চালাইয়াছি, আমাদের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দেও, পরে তুমি যথুণায় যাইও।

শিবজীর মস্তকে যেন বশ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বাকার করিলে সেনিকেরা বল প্রকাশ করিবে, বিবাদের সম্ভবতঃ সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে, কেন না, দিল্লীতে একজন সৈনিক ছিল না যে, শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্দায়ন করিলে সম্ভবতঃ বিপদ। ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী গম্বুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল,—এ স্বর আমি জানি, আমি দক্ষিণদেশে গায়েস্তা খাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পথিক গোস্বামী নহে।

অপর জন বলিল,—তবে কে?

প্রথম। আমি সন্দেহ করি, এ স্বয়ং শিবজী। দুইজন মহুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে, শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে গুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল!

দ্বিতীয়। ভাল, মস্তকের বজ্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উজ্জীব দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী তাঁহাকে চিনিলেন, তিনি গায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী।

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু হস্তেও একজনকে যুষ্টি-আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসি হস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্দুখ্য হইয়া আরংজীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শত্রুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আশ্রুত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী

তীরবিন্দু হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিনজন শত্রুই ভূতলশায়ী। তিনজনই গতজীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীকে নিকটে ডাকিয়া জীবনরক্ষার জন্ত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী।

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,— সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বদ্ধ আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্যের জন্ত আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?

সীতাপতি শিবজীর সন্মুখে জাহ্নু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন,— রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রত্ননাথজী হাবিলদার! জ্ঞান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবনকাল আপনার সেবা করিগ, ইহা ভিন্ন অত্র কামনা নাই, অত্র পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রহ্ন নিঃপ্রাণের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রত্ননাথের দিকে চাহিলেন, জনৈক উদ্বেগ সঞ্চার করিতে পারিলেন না। সজল-নয়নে রত্ননাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—রত্ননাথ! রত্ননাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আনাকে যথেষ্ট দ

দিয়াছ। তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তোমার অবমাননা করিয়া-
ছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত
থাকিবে, তোমার গুণ বিস্তৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি এ মহৎ ঋণ
পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্র নিম্নরূপ রজনীতে উভয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনস্থখে বিযুক্ত
হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অস্ত্র শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অস্ত্র
দূর হইল, বালকের ভ্রাতা উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদে

কি দারুণ বুকের ব্যথা ।

সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পীরিতের কথা ॥

সই ! কে বলে পীরিতি ভাল ।

হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল ॥

কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী পীরিতি করে ।

ভূষের অনল যেন সাজাইয়া প্রমত্তি পুড়িয়া য়রে ।

হায় বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি ।

চণ্ডিদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ সংশয় দেখি ॥

চণ্ডিদাস ।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরসু দেখিলেন, হৃদয় শূন্য । যে স্বদেশীয় যোদ্ধাকে প্রথম দর্শন করিয়াই সরসু চকিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, যাহাকে কয়েক মাস অবধি সংস্রব হৃদয়েষর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, যাহাকে জনার্দন বিবাহের বাক্যদান করিয়াছিলেন, সে রঘুনাথের অদর্শনে আজি সরসুর হৃদয় শূন্য ।

সে দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরসু হৃদয়ের ধন আর ফিরিয়া পাইলেন না । অন্ধকার নিশীথে কখন কখন

বালিকা একাকী গব্যাক্ষপার্থে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে সেই গব্যাক্ষ দিগ্বা পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া রঘুনাথ আর আসিলেন না !

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযু আশ্র-কাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগ্রিত হইত। ভোরগর্গের কথা, কণ্ঠমালার কথা, রায়গড়ে আগমনের কথা, বিদায়ের কথা। নীরবে সরযুর গণ্ডস্থল দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু বহিত, কখন কখন রজনীতে সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্বাটিত হইত, ভাদ্রমাসের নদীর জ্বাল শোক-পারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার জ্বাল নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমচ্ছটা পূর্ব-দিকে দেখা দিত। বালিকা তখনও শোকে বিবশা হইয়া মুগ্ধিত রহিয়াছে।

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উঠানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চরন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন, কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশিশিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সাংস্রকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন, আহা! সে শোকের গীত শুনিয়া শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। এরূপ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল। সরলস্বভাব জনার্দন এখনও সরযুর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরসু অনেক যত্ন শোক সম্বোধন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অস্বপ্নান করিয়াছিল। তাহারা বধাচ্ছলে বৃদ্ধ জনাৰ্দ্দনকে বলিল,—সরসুর বয়স হইয়াছে, বিবাহ স্থির করুন। সরসুর কাণে এ কথা উঠিল। সরসু বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও আমার বিবাহে কচি নাই চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।

জনাৰ্দ্দন সে কথা মানিলেন না, বিবাহের পাত্র স্থির করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রোচিত দ্বারা পানিতা ভক্ত ক্ষত্রিয়কন্তার পাতের অভাব ছিল না, অবশেষে রাজা জয়সিংহের একজন প্রধান সেনানীর সহিত বিবাহ স্থির হইল। সরসুর কাণে এ কথা উঠিল, সরসু শিহরিয়া উঠিলেন। লজ্জার মাথা ধাইয়া পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও, তিনি অল্প একজন সেনানীক বাক্যদান করিয়াছিলেন, তিনিই আমার বগদত্ত পতি। অল্প কাহারও সহিত বিবাহ হইলে ব্যভিচার-দোষ ঘটিবে।

জনাৰ্দ্দন এ কথা শুনিয়া ক্রটি হইলেন, সরসুকে কতক ভিরস্বাস করিলেন, আবার নিভের ঘরে গিয়া মনের দুঃখে কাঁদিলেন। অবশেষে কন্তার আগন্তি গ্রাহ্য না করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন, রাজা জয়সিংহকে জানাইলেন। সরসুর কাণে এ কথা উঠিল। সরসু ভগ্নন নিজে পিতার পদে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; স্বপ্নে বোলন করিয়া বলিলেন,—পিতা কমা করুন, এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন, নচেৎ আপনাদি চিরপালিতা এই অভাগিনী কন্তাকে জন্মের মত হারাইবেন। জনাৰ্দ্দন কন্তাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু কন্তার কথা কে গ্রাহ্য করে, পাঁচজন ভ্রাতৃলোক যেরূপ পরামর্শ দেয়, সমাজে থাকিলে সেইরূপ কাজ করিতে হয়। বিবাহের

দিন নিকটে আগিতে লাগিল, জনার্দন অনেক বুঝাইলেন, অনেক কঁাদিলেন, অনেক ভিত্ত্বার করিলেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাহের পূর্কদিন সন্ধ্যাকে বলিলেন,—পাপীষ্যসি, তোর জন্ত কি আমি এই বৃদ্ধবয়সে অবমানিত হইব ? তুই তোর পিতার নিঙ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি ?

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সন্ধ্যা উত্তর করিলেন,—পিতঃ। আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি, মার্জনা করুন। কিন্তু অগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমি হইতে আপনার অবমাননা হইবে না।

এ কথার অর্থ তখন জনার্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের দিন বিবাহের কণ্ঠাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

টীকা

দ্বঃখে স্নেহে শ্রুনা শরৎকাল ভাবে ।
আখিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে ॥
কার্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ ।
গৃহে নাহি আগনাখ করি শনবাগ ॥

যুক্তরাম চক্রবর্তী ।

শরৎকালের প্রাতের কমলীয় আলোকে বেগবতী নীরানদী বহিয়া যতাইছে, সূর্য্যকিরণে জলের ছিল্লোল ছাড়া করিতে করিতে যাইতেছে । সেই শ্রুনা নদীর উত্তর পার্শ্বে শ্রুনা শতক্ষেত্র বটদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পুজায় যেন সজ্জ হইয়া মেদিনী সে চরিত্র পরিচ্ছদে ছাড়া করিতেছে । উত্তর ও পূর্বদিকে সেইরূপ শ্রামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা স্রুনে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্বতরাশির পর পর্বতরাশি বাল-সূর্য্যকিরণে অঙ্গুল শোভা দারণ করিতেছে ।

সেই নদীকূলে শ্রামক্ষেত্রবেষ্টিত একটি শ্রুনা গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল । গ্রামের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটারের নিকট একটি বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে ।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সস্ত্রান্ত বলিয়াই বোধ হয় । প্রান্তে দুই

একটি গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটি গরু বাধা রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয়, গৃহস্থানী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, ব্যঙ্গা ও মহাজনৌ-কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া ও শ্যামবর্ণা, চঞ্চল, প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একবার মাতা যে ঘরে বন্ধন করিতেছে, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার দাসীগ্ন নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে।

বালিকা বলিল,—দিদি, আয় না, কালকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।

দাসী। না দিদি, মা বারণ করেছেন, ঘাটে যেও না।

বালিকা। মা টের পাবে না।

দাসী। না ছি, মা যা বারণ করেন, তা করিতে নাই, মার কথা কি অগ্রথা করে ?

বালিকা। আচ্ছা দিদি, মা কি তোরাও যা হয় ?

দাসী। হয় বৈ কি।

বালিকা। না, সত্য করিয়া বল।

দাসী। সত্যই যা হয়।

বালিকা। না দিদি, তুই যে রাজপুত্রের মেয়ে, আমরা ত রাজপুত্র নই।

দাসী বালিকাকে চুষন করিল ; বলিল,—তবে জিজ্ঞাসা কর কেন ?

বালিকা। জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই যাকে মা বলিস্ কেন ?

দাসী। যিনি আমাকে খাইতে পরিত্তে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন, যিনি আমাকে মেয়ের মত লালন-পালন

করেন, তাঁকে যা বলিব না ত কি বলিব ? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, যা আমাকে অগতে স্থান দিযাছেন।

বালিকা। ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি ?

দাসী। না দিদি, কাঁদিব কেন ?

বালিকা। তোর চক্ষে জল দেখলে আমার চক্ষে জল আসে।

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—তুমি যে আমাকে ভালবাস।

বালিকা। আর তুই আমাকে ভালবাসিস্ ?

দাসী। বাসি বৈ কি।

বালিকা। বরাবর ভালবাসুবি, কখনও আমাকে তুলুনি ?

দাসী। না। আর তুমি দিদি, তুমি আমাকে ভালবাসুবে, কখনও তুলবে না ?

বালিকা। না।

দাসী। হাঁ, তুমি আমাকে একদিন তুলবে।

বালিকা। কবে ?

দাসী। যবে তোমার বয়স আসিবে।

বালিকা। সে কবে ?

দাসী। আর ছুই এক বৎসরের মধ্যেই।

বালিকা। না দিদি, কখনও তোকে তুলিব না, বরং চেয়ে তোকে অধিক ভালবাসুবি, আর তুই দিদি, তোমার যখন বয়স আসুবে, তখন আমাকে তুলুবি নি ?

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, সে বলিল,—না, কখনও তুলিব না।

বালিকা । বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাসবি ?

দাসী হাস্য করিয়া বলিল,—সমান সমান ।

বালিকা । তোমার বর কবে আসবে চিদি ?

দাসী । ভগবান্ জানেন ছাড়, রাত্রার বেলা হইয়াছে, আমি যাই ।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাধিনী সরযুবালা অগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটিতে দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন । কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ । গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও মেহমুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুতকন্যাকে নিজের বাটিতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন । গোকর্ণের গৃহিনীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুতকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার স্থায় লালন-পালন করিতেন । সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, স্ত্রীরাং কৃষক ও কৃষক-পত্নীর কার্যের অনেক লাগুব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন ।

রঘুনাথের অন্তর্ভাবনে যদি সরযুর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরলা গৃহিনীর বাটিতে থাকিয়া সরযু পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন । গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ । গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে । শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ভালবাসিতেন । প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্যে বা অন্য কার্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত

কার্য্য নির্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন,— বাছা, তুমি তদ্রলোকের মেয়ে, একরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমায় করিতে হইবে না, আমিই করিব। সরগু স্নেহে উত্তর করিতেন,—মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি অন্য জন তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও। স্নেহবাক্যে সরল-স্বভাব বৃদ্ধা গৃহিণীর নহনে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,—সরগু! বাছা, তোমার মত মেয়ে আমি কখন দেখি নাই। তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিই। পূর্বে অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে কথা অরণ করিয়া প্রাচীনা কণ্ঠে রোদন করিলেন।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। একদিন সাংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়া আছেন, এক প্রান্তে সরগু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, একরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,— গৃহিণি, শাস্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।

গৃহিণী। আচ্ছা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ?

গোকর্ণ। শিখাই পাইব। পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল, অস্ত্র গুলিলাহ, শিবজী দৃষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন। আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।

গৃহিণী। আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় এক বৎসর হইল, বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন।

গোকর্ণ। ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হান্সদাসের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীরও সংবাদ পাইয়াছি।

সরগুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে খাগ কঁক করিয়া তিনি

গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন, সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল, মনে আছে ?

গৃহিণী। আমি যেয়েমামুখ, আমার কি অত মনে থাকে ?

গোকর্ণ। পুত্র বলিয়াছিল,—পিতা, আমি হাবিলদারকে চিনি, তাঁহার জায় বীর শিঞ্জীর গৈলো আর নাই। কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজ্য তাঁহার অবমাননা করিলেন, পশ্চাৎ জানিবেন, তখন তিনি রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন। গুণের কথা এত দিনে মত হইল।

সরযু হৃদয় উল্লাসে, উদ্বেগে ছুরু ছুরু করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক হইতে ষেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন,—রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, শিবজী রঘুনাথের নিকট আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবিলদারের পদ হইতে একেবারে পাঁচহাজারী করিয়া দিয়াছেন। সহরে অস্ত্র কথা নাই, হাটে-বাজারে অস্ত্র কথা নাই, গ্রামে অস্ত্র কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব-কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধনুবাদ দিতেছে।

আনন্দে, উল্লাসে সরযু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদর্শন

বধূ, কি আব বলিব আমি ।

মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ চুইও ছুঁব ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে, বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসি ।

সব সমর্পিয়া, একমন লইয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

ভাবিয়া দেখিলাম, এ ভিনা দুবনে, 'খার কেহ যের আছে ।

রাধা বলি কেহ স্মৃতিতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

এ-কূলে ও-কূলে গোকূলে ছুকূলে, আপনা বলিব কায় ।

নীতল বলিয়া শরণ লইলাম, ও দুটি কনক-পায় ॥

চণ্ডিদাস ।

সেই দিন অবধি সরস্বতী আকর্ষিত ফিরিল । ঐতিহাসিক আশা, আনন্দ ও উল্লাস আবার সেই ফুরিয়ে গেল । নগর দুইটি আবার হাশিল, ষষ্ঠ দুইটি আবার প্রাকৃতিক সুন্দর, প্রাণের পরিচয় দায়ক করিল, ললাট ও স্নান গুণে আবার লাভ্য হুটিল, রেশমাবলি ও কেশ-গুলি আবার সেই স্নান, মধুময়, লাভ্যময় সুখবানিকে পইয়া খেলা করিতে লাগিল । প্রাতঃকালের স্নান সমাপনের সহিত দ্রব্য হইতে কোকিলের রব আসিলে সরস্বতী উল্লাসিত ফুরিয়ে সেই রব উনিতেল ;

অপরাহ্নে গৃহকার্য সমাপন করিয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নম্রন দুইটি সূর্য্য-উত্তাপ হইতে হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়া নদীর অপর পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিতেন; আবার সন্ধ্যার সময় দূরে বংশীধ্বনি হইলে চকিত যুগের স্রায় সহসা চমকিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণের কত্যা পর্য্যন্ত সরযু এই পরিবর্তন দেখিতে পাইল। এক-দিন সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে যাইবার সময় কত্যা জিজ্ঞাসা করিল,—
দিদি, দিন দিন তোমার রূপ কেমন ফুটে বেরুচ্ছে।

সরযু। কে বলিল?

বালিকা। বলিবে কে? আমি বুঝি দেখিতে পাই না?

সরযু। না, ও তোমার দেখিবার ভুল।

বালিকা। হাঁ ভুল বৈ কি? আর আগে মাথায় কিছু থাকিত না, এখন মধ্যে মধ্যে চুলের তিতর ফুল গোঁজা হয়, তা বুঝি আমি দেখিতে পাই না?

সরযু। দূর!

বালিকা। আর লুকাইয়া লুকাইয়া গলায় একটি কর্ঠমালা পরা হয়, তাহাতে দুইটি করিয়া মুক্তা, একটি করিয়া পলা, তা বুঝি আমি দেখিতে পাই না?

সরযু। দূর!

বালিকা। আর নদীর তীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুলর মুখখানি জলে দেখা হয়, তা বুঝি আমি দেখি না?

সরযু। মিথ্যা কথা বলিও না।

বালিকা। আর গাছতলার লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে কুহবরে গান করা হয়, তাহা বুঝি আমি শুনি না?

সরযু এবার আসিয়া বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল,—আমি এ সব কথা মাকে বলিয়া দিব।

সরযু। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বলিও না।

বালিকা। তবে একটা কথা জিজ্ঞাস করি, বলিবে ?

সরযু। বলিবে।

বালিকা। এর অর্থ কি ? এ পুষ্প, এ কণ্ঠমালা, এ গীত কাহার জন্ত ?
তোমার চক্ষু দুইটি যে সদাই হাসিতেছে, তোমার ওষ্ঠ দুইটি যে রক্তে ফেটে
পড়িতেছে, তোমার সমস্ত শরীর যে লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছে, এ কাহার
জন্ত ?

সরযু। তোমার মা তোমার খোঁপা বাঁধিয়া দেন, গঠনা পরাইয়া
দেন, সে কাহার জন্ত ?

বালিকা আর একটু লজ্জিত হইল, বলিল,—মা বলিয়াছেন,
আগামী বৎসর আমার বিবাহ হইবে, আমার বর আসিবে।

সরযু। আমারও বর আসিবে।

বালিকা। সত্য ?

সরযুর সহিত বালিকার কথা হইতেছিল, এমন সময় একজন
দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী “হর হর মহাদেব” শব্দ উচ্চারণ করিয়া নদীতীরে
উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে তাঁহার বিভূষিত-ভূষিত
দীর্ঘ শরীর বড় সুন্দর দেখাইল। বালিকা তব্বে পলায়ন করিল, সরযু
ভীকৃদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী সীতাপতি গোস্বামী !

সরযুর হৃদয় সহসা কম্পিত হইল, ননের আবেগে সমস্ত শরীর
কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সরযু সে আবেগ সংবরণ করিয়া লজ্জা বা
ভয় ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট বাঁহিয়া প্রণাম করিয়া
হিরণ্যবরে বলিলেন,—প্রভু, আপনি যে অত্যাগিনীকে এক দিন জন্মদিনের

প্রাসাদে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে অল্প এই কুটীরে দাসীকার্যে নিযুক্ত দেখিতেছেন। পিতা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি বাগ্‌দত্ত পতির অমুচারিণী, ইহা ভিন্ন আমার অন্য দোষ নাই।

সন্ন্যাসীর নয়ন জলে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—রঘুনাথের অল্প এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ ?

সরযু। নারী ষ গদিন পতির নাম জপিতে পারে, ততদিন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না।

সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল ক্ষীণ হইতে লাগিল।

সরযু আবার বলিলেন,—প্রভুর সহিত কি সেই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

গোস্বামী। হইয়াছিল।

সরযু। প্রভু তাঁহাকে দাসীর কথা জানাইয়াছিলেন ?

গোস্বামী। জানাইয়াছিলাম।

সরযু। কি জানাইয়াছিলেন ?

গোস্বামী। আপনার একটি বাক্য, একটি অক্ষরও বিস্মৃত হই নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—সরযু রাজপুত্রবালা, জীবন অপেক্ষা বশ অধিক জ্ঞান করে। সরযু যতদিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে।

সরযু। ভাল।

আমি তাঁহাকে আরও জানাইয়াছিলাম, যদি কর্তব্যসাধনে তাঁহার প্রাণবিস্রোগ হয়, সরযু তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিবে।

সরযু। ভাল।

গোস্বামী। আমি আরও তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, সরযু তাহার উন্নত উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করিবে না। রঘুনাথ অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাহার সহায় হইবেন !

উদ্বেগ-গদগদস্বরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন ?

অলস্ত-স্বরে গোস্বামী উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ উত্তর দান করেন নাই, কেবল আপনার কথাগুলি জনস্বরে ধারণ করিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গোস্বামীর নয়ন ধক্-ধক্ করিয়া জলিতেছিল, সেই নদীতীরে ও বৃক্ষমধ্যে গোস্বামীর অলস্ত বাক্যগুলি বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

“যিনি জগতের আদিপুরুষ, তাঁহাকে প্রমাণ করি”—এই বলিয়া সরযুলা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়করে প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে উভয়ের শরীর শীতল হইল, নয়নের জল শুকাইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর গোস্বামী কহিলেন,—দেবতার প্রসাদে কার্যসিদ্ধ করিবার পথ রঘুনাথ একটি কথা আমার দ্বারা আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

সরযু উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি ?

গোস্বামী। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদিন সরযু তাঁহার দাসকে মনে রাখিবেন ? আমি যাইলে সরযু আমাকে চিনিতে পারিবেন ?

সরযু। এ জীবনে কি আমি তাঁহাকে হুনিতে পার ?

গোস্বামী । আপনার ভালবাসা তিনি জানেন, তথাপি নারীর মন সৰ্কুদাই চপল, কি জানি, যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন ।

গোস্বামীর চপলতা ও ঈষৎ হাস্য দেখিয়া সরযু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন ; বলিলেন,—নারীর মন চপল, তাহা আমি জানিতাম না ।

গোস্বামী । আমিও জানিতাম না, কিন্তু অস্ত্র দেখিতেছি ।

সরযু । কিসে দেখিলেন ?

গোস্বামী । যিনি আমার বাগ্দস্তা বধু, তিনি আমাকে অস্ত্র ভুলিয়াছেন, দেখিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন নাই ।

সরযু । সে কোন্ হতভাগিনী ?

গোস্বামী । তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহাকে তোরণদুর্গে জনার্দনের গৃহের ছাদে প্রথম দর্শন করিয়া আমি মন-প্রাণ হারাষ্টয়াছিলাম ; তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার কণ্ঠে মুক্তামালা একদিন-পরাইয়া দিয়া আমি জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম ; তিনি সেই ভাগ্যবতী, যিনি তোরণদুর্গে জয়সিংহের শিবিরে, যুদ্ধের সময় ও সন্ধির সময়, সৰ্কুদাই আমার নয়নের মণির স্থান ছিলেন ; তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার দর্শন আমার নয়নে সূর্যালোক, যাহার শব্দ আমার কর্ণে সঙ্গীত, যাহার স্পর্শ আমার শরীরে চন্দন-প্রলেপ, যাহার প্রীতি আমার জীবনের জীবন ! তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার নাম স্মরণ করিয়া, যাহার জলন্ত উৎসাহবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি দিল্লীযাত্রা করিয়াছিলাম, যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, অনন্ত বিপদসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি । বহুদিন পর, বহু বিপদ পার হইয়া, অস্ত্র সেই ভাগ্যবতীর চরণোপাঙ্গে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কি আজ চিনিতে পারিবেন ?

সেই কোকিল-বিনিমিত স্বর সরযুর হৃদয় মগ্নন করিল, তারকা-লোকে ছদ্মবেশধারী সেই দীর্ঘকায় পুরুষশ্রেষ্ঠকে সরযু চিনিতে

পারিলেন। সরযু হৃদয়ের আবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছিল, নয়ন নুদিত হইয়াছিল। “রঘুনাথ! ক্ষমা কর।”—এইমাত্র কহিয়া সরযু রঘুনাথের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। পতনোন্মুখ প্রিয়তমা-দেহ রঘুনাথ নিজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, সেই উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।

ক্ষণেক পর চৈতন্তলাভ করিয়া সরযু নয়ন উন্মোচিত করিলেন। কি দেখিলেন? হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, চির-প্রার্থিত পতি আজ সরযুকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন।

বহুদিন পর আজ সরযুর তপ্ত হৃদয় রঘুনাথের প্রণাল্য হৃদয়-স্পর্শে শীতল হইল; সরযুর ঘনবাস রঘুনাথের নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, সরযুর কল্পিত রক্তবর্ণ গুষ্ঠদ্বয় জীবনের মধ্যে প্রথমবার রঘুনাথের গুষ্ঠ স্পর্শ করিল।

সে সংস্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। সেই প্রিয় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে সেই বারংবার ঘন চুষনে বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন?

বায়ুতাড়িত পত্রের স্তায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন,—জগদীশ্বর! ৫ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখানন্দা হইতে কখনও আগরিভ না হই!



দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জীবন-নির্ব্বাণ

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন্ ।

যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন ॥

ধর্ম্ম অমুসারে জয় দেখর বচন ।

কাশীরাম দাস ।

মহারাত্রিদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল । শিবজী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরঞ্জীবের সাহিত যুদ্ধ করিবেন, স্নেহদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন । নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল ।

একদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না । তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্ত যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সৈন্তসম্যেত বিনাশ ভিন্ন আরঞ্জীবের অস্ত্র কোনও উদ্দেশ্য নাই । তখন তিনি বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আরলাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

শেষ পর্য্যন্ত আরঞ্জীবের বিশ্বস্ত অমুচরের স্তায় কার্য্য করিলেন ; আরঞ্জীব তাঁহার প্রতি অভ্যস্ত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুহুর্তের জন্তও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না । যখন নিশ্চয়

দেখিলেন, মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাঁহাতে হইবে, তখন পর্যন্ত যতদূর সাধ্য সন্ত্রাস্টের ক্ষমতা-রক্ষার চেষ্টা করিলেন। জৌহড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে সন্ত্রাস্টের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, ভজিল যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন—যেন আর ক্ষত্রীয় ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এজগতে একুপ বিশ্বস্ত বার্য্যের পুত্রকার নাই। জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরও ভীষ্ম যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার তত্ত্ব তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে ভলব করিলেন। যশোবন্তসিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বুদ্ধ সেনাপতি আত্মদৈন সাধামতে দিল্লীর কায়াসাধন করিয়াছিলেন, শেষদশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, বুদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন, একুপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন, মহারাজ, একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানী আপনার দর্শনাভিনাসী, তিনি আপনার চরণোপাঙ্গে বসিয়া একদিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একবার উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছেন।

রা ১ উত্তর করিলেন,—সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি আমুন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি।

কণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন,—সুন্দর শিবজী! মৃত্যুর

পূর্ক আর একবার আপনার সহিত দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম।
উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না।

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন,—পিতঃ ! যখন শেষ আপনার নিকট
বিদায় লইয়াছিলাম, তখন আপনাকে এত শীঘ্র একরূপ অবস্থায় দেখিব,
কখনও মনে করি নাই।

জয়সিংহ। রাজন্। মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি ?
শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি যোগল
সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলেন, এখন কি দেখিতেছেন ?

শিবজী। মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন,
আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন যোগল সাম্রাজ্যের আর
আশা নাই।

জয়সিংহ। বৎস ! তাহা নহে। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী,
জয়সিংহ মরিলে অত্র জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ত্রায় শত যোদ্ধা
এখনও বর্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শিবজী। আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের আর অধিক কি
অনিষ্ট হইতে পারে।

জয়সিংহ। শিবজী ! একজন যোদ্ধা যাইলে অত্র যোদ্ধা হয়,
কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি
পূর্বেই বলিয়াছিলাম, যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও
মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।

শিবজী। নিবেদন করুন।

জয়সিংহ। যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম, তখন
আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; আপনার স্থির

সফল ছিল, দিল্লীখর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণদেশে একজন পরাক্রান্ত বদ্ধ থাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে এবজন দুর্জয়নীয় শত্রু হইয়াছে।

শিবজী। মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, অগতে সকলে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।

জয়সিংহ। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যতদূর সাধ্য দিল্লীখরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি-বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্ম-পর বিবেচনা করি নাই, যাহার কার্যে ত্রুটি হইয়াছি, জীবন পণ করিয়া তাহার কার্যসাধন করিয়াছি। বহুকালে সম্রাট আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন, পরে অবমাননা করিলেন। তথাপি উৎসাহে আমায় আমার কার্যে বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রদান প্রদান কর্ণে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী তাহার বিনা দুই আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। বিহ্বল অচরণে আরংজীব স্বয়ং কতিপয় হইলেন। অমরাধিপেরা, দিল্লীখরের চিরবিশ্বস্ত অমুচর ও সহায়, অমরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রদান শত্রু হইবে।

শিবজী। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আরংজীব আপন অসদাচরণে অমর ও মহারাত্রী এই দুইটি দেশকে তাহার শত্রু করিয়াছেন।

জয়সিংহ। দুইটি উদাহরণ দিলাম, মহারাত্রীদেশ ও অমরদেশ। সমস্ত ভারতবর্ষ এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত অমুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাগসী-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন,

রাজস্থানে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, সৰ্বদেশে হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিতেছেন।

কণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া জয়সিংহ অতি গভীরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, যেন মৃত্যুশয্যায় মহাশ্মার দিবাচক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,— শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারিদিকে হুঙ্কানল প্রজ্জ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল জ্বলিল, মহারাষ্ট্রদেশে অনল জ্বলিল, পূৰ্বদিকে অনল জ্বলিল। আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্মাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধবয়সে পশ্চাত্তাপ করিয়া দিল্লীখর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক্ হইতে ধূ ধূ শব্দে অগ্নির হইতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ। অগ্নির হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর!

রাজার বচনরোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন, গোপনে অস্পষ্ট স্বরে রোগের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃত্যুস্বরে জয়সিংহ বলিলেন,— কপটাচারী আপনাকেই শান্তিদান করে, ‘সত্যমেব জয়তি’।

স্বাস্রোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

ধনুর্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি,
চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জালা—
এ বিষম জালা যদি পারি রে তুলিতে ।

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী এক প্রহরমাত্র আছে, একুশ সময়ে শিবজী রাজপুত-শিবির ভাগ করলেন । প্রাতঃকালের পূর্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন, কণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“বজ্রগণ ! হোয় এক বৎসর হইল, আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম, আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি বণ্ডন হইয়াছে । অস্ত্র আমরা সে কপট আচরণের প্রতিশোধ দিব, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব ।

“যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী বাহার সহিত যুদ্ধ নিবেশ করিয়াছিলেন, বাহার নিকট শিবজী বিনামুছে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কল্যা নিম্নীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে প্রাণবিসর্জন করিয়াছেন । সৈন্যগণ ! দিল্লীতে আমার

কারারোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা পরিশোধ করিব।

“মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইরাছিল, তিনি দেখিলেন, মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল, মহারাত্রীদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল, দিল্লীর সিংহাসন স্বরায় শূন্য! বজ্রগণ! অগ্রসর হও, পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

“পূর্বদিকে রক্তিমচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমচ্ছটা। কিন্তু উহা আমাদের পক্ষে সামান্ত প্রভাত নহে; মহারাত্রীগণ! অস্ত আমাদের জীবন-প্রভাত।”

সমস্ত সেনানী ও সৈনিকগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জিয়া উঠিল,—অস্ত আমাদের জীবন-প্রভাত।



চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিচার

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।

কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন। আপনার পদোন্নতি, সন্ধ্যার সহিত পুনর্জীবন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের তাবী স্বাধীনতা, একুশ নূতন নূতন বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উদ্ভুল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন,—“রঘুনাথ।”

রঘুনাথ পশ্চাদ্ধিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রাও জুমলাদার। রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানা-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিশ্বৃত হইয়েন নাই।

চন্দ্রাও বলিলেন,—রঘুনাথ। এ অগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই। একজন মরিব।

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন,—চন্দ্রাও! কপটাচারী মিত্রহত্যা চন্দ্রাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন, জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

চন্দ্রাও। বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাগ নাই। তোমার

আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমিও তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি বিচক্ষণেতে দেখিভাগ, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সংকল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশভ্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিজ্রোহী বহিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি। চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ ত্রিবাংসা তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তোমার ভাগ্য মল, পুনরায় উন্নত-পদ লাভ করিয়া সৈন্তমধ্যে আগিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অস্ত্র উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ শিলাসা নির্মাণ করিব। ভীক! অস্ত্র আমার হস্তে রক্ষা নাই।

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন,—পামর! সমুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিশ্বত হইব, তোর পাপের দণ্ড দিব।

চন্দ্ররাও। ভীক! এখনও যুদ্ধে পরাজুথ? তবে আরও শোন! উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সে শত্রু-নিষ্কিণ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহত্যা।

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিক্ষেপিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাও ক্ষীণহস্তে অসিধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অগ্নিতে উভয়ের ঢাল ক্ষত হইল, শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ভায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা

করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি চন্দ্রাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জাহ্নুস্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন,—পামর ! অত্ন তোমার পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হইল, পিতার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্রাও নির্ভীক, তিনি বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর তোমার ভগিনী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া শ্বেবে প্রাণবিসর্জন করিব।

বিদ্রোহের ত্রায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল। এই অস্ত্র লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এ অস্ত্র চন্দ্রাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্রাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে। রোগে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্রাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় যোদ্ধা পরস্পরের দিকে হিরদৃষ্টি করিয়া রোগে প্রকলিত হতাশনের ত্রায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চন্দ্রাও অসিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ধূলি ও কন্দমে ধুলিরিত হইয়া বিকট অসুরের ত্রায় আবদ্ধ নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিত লাগিলেন। রঘুনাথ পিতার মৃত্যু-কথা ও ভগিনীর অবমাননা-কথা শ্রবণ করিয়া রোদে, অতিমানে ও ভিখাংসায় বিদগ্ধচেতা অথচ শান্তিদানে অপারদগ হইয়া চিত্রাপিত ব্রহ্মপুত্রের ত্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সহসা একজন যোদ্ধা নিক্রান্ত হইলেন। উভয়ে সভয়ে দেখিলেন,—শিবজী !

শিবজী কোন কথা কহিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আপনার সহচরচারিজন সৈন্তকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই চারিজন সৈনিক

নিম্নকে চন্দ্রাওয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে অসি ও চন্দ্র কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার হস্তদ্বয় পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজী অদৃষ্ট হইলেন, রঘুনাথ চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রাওয়ের বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে। রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণের পূর্বে শত্রু রহমৎ খাঁকে চন্দ্রাওই গুপ্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতঃ তাহারই বিচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আফগান-সেনাপতি রহমৎ খাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎ খাঁ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন, তখন রহমৎ খাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হইলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও গুণ্ণবা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎ খাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বেদিন জয়সিংহ রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রহমৎ খাঁ বলিলেন,—আমার মরণের জন্ত আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি ষে রূপ সদাচরণ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন, আপনার নিকট আমার অবস্তু কিছুই নাই।

জয়সিংহ। রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল। সে কে, আমরা জানি না, আমার বোধ হয়, একজন অস্বাভাবিক দণ্ডিত হইয়াছে।

রহস্য। আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজপুত্র! আপনার ভ্রাতাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।

জয়সিংহ। যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোন নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহস্য। প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করিবেন না।

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহস্য তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন। রহস্যের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন। বিজোহী চম্ভরাও!

চম্ভরাও রহস্য তাঁকে বহুস্তলিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অস্তিত্ব যে যে কাগজ ছিল, তাহাও পাঠ করিলেন, চম্ভরাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারার্থে অধিক সময় আবশ্যক হইল না শিবজীর চিরবিখ্যাত মন্ত্রী রঘুনাথ ভায়শাজী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন! যখন পাঠ সমাধা হইল, তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। চম্ভরাও বিজোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ

দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিকলক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন,—পাপাচারী নির্দোহী, তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে ?

মৃত্যু সময়েও চন্দ্রাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দমনীয় দর্প অভিমান এখনও পূর্ববৎ। বলিলেন,—আমি আর কি বলিব ? আপনার বিচার-ক্ষমতা প্রশিদ্ধ ! একদিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অজ্ঞ আমাদের দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর একজনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন, চন্দ্রাও এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ জাল।

এই বিজ্ঞপে শিবজী মর্যাদাসিক তুচ্ছ হইয়া আদেশ করিলেন,—অজ্ঞাদ, চন্দ্রাওয়ের ছুই হস্ত ছেদন কর, তাহা হইলে আর যুগ লইতে পারিবে না। তাহার পর তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে “বিশ্বাসঘাতক” অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

অজ্ঞাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে ঘাইতেছিল, এক্ষণ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—মহারাজ ! আমার একটি নিবেদন আছে।

শিবজী। রঘুনাথ ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব ; কেন না, এই পামর তোমার প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল ; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। মহারাজের অস্বীকার অলঙ্ঘ্য। আমি এই প্রতিহিংসা যাক্সা করি যে, চন্দ্রাওয়ের কেশাও কেহ স্পর্শ না করে—অনুগ্রহ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তি দিন।

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ ।

শিবজী ক্রোধ সঞ্চার করিয়া কহিলেন,—তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার অনুরোধে সে জ্ঞাত চক্ররাওকে ক্ষমা করিলাম । রাজবিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা । সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, ভুল্লাদ, আপন কার্য্য কর ।

রঘুনাথ । মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট তিস্তা চাহিতেছে, চক্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন ।

শিবজী । এ তিস্তাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ, তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম, অত্বে এতদূর ক্ষমা করিতাম না । শিবজীর আদেশের উপর কথা কহিও না ।

রঘুনাথ । প্রভু, দুই একটি বুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও অভিনবিত দাসকে পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন । অত্বে সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চক্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন ।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল । গজেন করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ ! রঘুনাথ ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অত্বে আমাদের বিচার অত্বে করিতে চাহ ? রাজ-আদেশ অত্বে হয় না ; তুমিও আপনার বীর্যের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও ।

এ তিরস্কার-বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল । তিনি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন,—প্রভু ! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই । অত্বে জীবনের মধ্যে প্রপদ্যার পুরস্কার চাহিয়াছি । প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হইবেন, এ দাস বিত্তীয়তার চাহিবেন না । দাসের কেবল এইমাত্র তিস্তা, প্রভু, সদয় হইয়া তাহাকে বিদায়

দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোবাম্বী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।

শিবজী ক্ষণেক নিশ্চর ও নিম্পন্দ হইয়া রহিলেন। তখন একজন অমাত্য নিকটে আসিয়া কাণে কাণে জানাইল, চন্দ্ররাও রঘুনাথের ভগিনীপতি, সেই জন্ত রঘুনাথ ভগিনীপতির প্রাণভিক্ষা করিতেছেন।

তখন বিশ্বয়পূর্ণ হইয়া শিবজী চন্দ্ররাওকে খালাস দিবার আদেশ করিলেন। শেষে বজ্রনাদে বলিলেন,—যাও চন্দ্ররাও, শিবজীর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হও। অত্র দেশে যাও, অত্র আত্মীয়-কুটুম্বকে বধ কর, অত্র মিত্রের সর্বনাশ-সাধন কর, শত্রুর নিকটে উৎকোচ গ্রহণ, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহাচরণ করিতে করিতে পাপ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত কর।

চন্দ্ররাও ভীক নহেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—বালক! তোরা দয়া আমি চাহি না, তোরা দেওরা জীবন আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। পরক্ষণেই আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাসার আপনার চিরনিকৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভ্যস্থলে পতিত হইল।



পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা-ভগিনী

মৃত পরিবার, কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া ।
জলবিশ্ব-প্রায়, সব মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া ॥

কৃতিবাস ওঝা ।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে ; এক্ষণে উপক্ৰাস-লিখিত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া বিদায় লইব ।

বৃদ্ধ অনার্দন পালিতকন্তাকে হারাইয়া বাতুলের ত্রাণ হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি পুলকিত হৃদয়ে রঘুনাথকে আহ্বান করিলেন, সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কস্তাদান করিলেন, সন্নয়র স্নাত্ত কে বর্ণনা করিবে ? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষদেব যখন সরযুকে কোমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সন্নয়র ওষ্ঠে যখন উক ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযু উন্মাদিনী হইলেন ।

আর রঘুনাথ ?—রঘুনাথ তোদগদগদে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অস্ত সার্থক হইল । সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সন্নয়র হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিমিত্ত দেহ হৃদয়ে ধারণ

করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জগৎ
বিস্মৃত হইলেন।

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া “দিদি”কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের
অমুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের
পুত্র ভীমজীকে উন্নীত করিয়া হাবিলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদির সর্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত “সমান
সমান” ভালবাসিতেন, এবং কয়েক বৎসর পরে একটি সৎসঙ্গীত সূচরিত্র
পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে সরযু ও রঘুনাথ
স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন। সরযু কন্ঠ্য কারণে কাণে বলিলেন,—দেখিও
দিদি! যাহা বলিয়াছিলে, সে কথা মনে রাখিও, বরের চেয়ে আমাকে
ভালবাসিবে!

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত্ত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত
সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।
যশোবন্তসিংহ যখন জানিতে পারিলেন যে, রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয়
অমুরের গজপতিসিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে স্বদেশে আহ্বান করি-
লেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যত দিন
জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ
অব্দের চৈত্রমাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, তখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র
শক্তজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অপমানিত বা
কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ আর মহারাজী থাকিলে
উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দনের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন
করিলেন। স্বর্গ্য-মহলের পুরাতন দুর্গে তিলকসিংহের প্রপৌত্র প্রবেশ
করিলেন।

পাঠক! ইচ্ছা, এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু

আর একজনের কথা বলিতে বাকী আছে, শাস্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কথা বলিতে বাকী আছে।

যে দিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই দিনই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িত-কেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন ঘোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণন করিতে পারে? অতঃ লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ঝাঁপ হইয়াছে, হৃদয় শূণ্য হইয়াছে, অগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে। শোকে, বিষাদে, নৈরাশ্রে, নব-বৈধবোর অসহ্য যাতনার বিধবা ঘন ঘন আর্তনাদ করিতেছে।

রঘুনাথ সাস্তুনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সাস্তুনা দূরে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাবপরিবর্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, লক্ষ্মীর নয়নে জল নাহি, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর স্নগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুস্তলী সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে, লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হঠলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল, আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোন কষ্ট থাকিল না।

সাক্ষনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,—প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি ?

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল যোচন করিয়া বলিলেন,—সত্য ভাই, তোমার দম্মার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের অস্ত্র রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে, শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে স্তবে রাখুন।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী। তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকালই জানি, এ অসহ্য শোক বৎকিৎ সত্ত্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মহুয্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর। আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসা ভ্রাতার বন্ধে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ক্রটি করিব না !

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন। সে হস্ত দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—ভাই, তোমার দম্মার শরীর, কিন্তু এক্ষীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সাযুগ্ন করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, হৃদয়েশ্বরের চিরনিজায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদম্মার দাসীকে অভিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রেময়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব-পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শাস্ত্যভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন। লক্ষ্মী সহমরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাতন্ময়ে চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন। ধীর, শাস্ত লক্ষ্মীর

একই উত্তর,— হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

অবশেষে রঘুনাথ সজ্জনয়নে বলিলেন,— লক্ষ্মী ! একদিন আমার জীবন নৈরাশ্রে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী, তোমার প্রেমে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি জাতীর কথা রাখিবে না ? তুমি কি ভ্রাতৃত্বকে ভুলবাস না ?

লক্ষ্মী পূর্ববৎ শান্তভাবে উত্তর বলিলেন,— ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা স্মরণিা-
ছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাণ্ডিয়া দেশ, পুরুষের
অনেক আশা, অনেক উত্তম, অনেক অবলম্বন, একটি যাইলে অন্যটি
থাকে, একটি চেষ্টা নিফল চেষ্টলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। ভাই, তুমি
সে দিন ভগিনীর কথা রাখিয়াছিলে, অল্প তোমার কলক দূরীভূত
হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুখঃ দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে।
কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে ? অল্প আমি যে নগনের মণিটি
হারাইয়াছি, তাহা কি জীবনে আর পাইব ? যে মহাপ্রা দাসীকে
এত ভালবাসিতেন, এত অমুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে
কি আর পাইব ? ভাই ! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড়
ভালবাসিয়াছ, অল্প সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কণ্টক
হইও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন, তাঁহার সহিত যাইতে
দাও।

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন, স্নেহময়ী ভগিনীর অকলে যুগ লুকাইয়া
বালকের ভ্রায় বর বর অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার
কপট সংসারে ভ্রাতা-ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের ভ্রায় পবিত্র স্মৃতি

প্রশ্ন আর কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর ত্রায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল। চক্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। হান্তবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মী চিতাপাশে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, যুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সাহসনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন। সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকট আসিলেন, বলিলেন,—ভাই! বালা-কাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসিতে, অল্প লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অল্প চিরস্থায়ী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর, স্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর ছুটি হাত ধরিয়া বালকের ত্রায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

স্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন,—ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি অজ্ঞ? পিতার ত্রায় তোমার সাহস, পিতার ত্রায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন, জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে। লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন। ভাই, বিদায় দাও, দাসীর অল্প স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইতেছে। জগতে আর রঘুনাথের কি আছে ? প্রাণের লক্ষ্মী। তাকে কিরূপে বিদায় দিব, তাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব ?—আর্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক বস করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। অনেক সাধুনা করিলেন, অনেক বুকাইলেন, বলিলেন,—ভাই, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষের যাছা ধর্ম, তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না ! ঐ দেখ, পূর্কদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

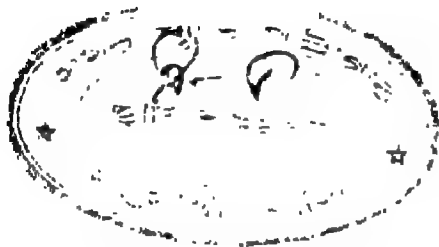
গদগদস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে, ঐ পুণাধামে আর একবার তোমাকে পাইব ; সে পর্য্যন্ত জীবমৃত হইয়া রহিলাম।

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপাথে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে যন্তক স্রাশন করিয়া বলিলেন,—হৃদয়েশ্বর ! জীবনে তুমি দাসীকে বড় ভালবাসিতে, এখন অমৃত্যু কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই, জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পার।

ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতা আরোহণ করিলেন ; স্বামীর পদপ্রান্তে বলিলেন, পদদ্বয় তক্তিতাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নমন মুদিত করিলেন ; বোধ হইল যেন, সেই যুগেই লক্ষ্মীর আত্মা বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জলিন ; অতিশয় দ্রুত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না।

সম্পূর্ণ



বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের পুস্তকের তালিকা

সাহিত্য-সাম্রাজ্যে ঔপন্যাসিক মহারথগণের প্রতিভা লুণ্ঠন
স্বগন্ধবিহীন ফিৎসু ফ-গুচ্ছ নহে—সর্বজন-প্রমোদন—প্রেম-স্বপ্ন মিলন!

প্রত্যেকখানি ১ টাকা মাত্র

১। ভুলের মাণ্ডল	১১। প্রণয় মিলন
২। নিষ্কর্মা	১২। বংশের কলঙ্ক
৩। নাতরৌ	১৩। ইন্দুমতী
৪। তীর্থের ফল	১৪। বিনিময়
৫। যেদিদা	১৫। পুষ্পরাণী
৬। নবীনা	১৬। সৈনিকবধ
৭। শম্ভুরাম	১৭। জীবনের ভুল
৮। গুপ্ত উপন্যাস	১৮। রূপের মোহ
৯। বিদ্রোহী শাসক	১৯। বিক্রমাদিত্য
১০। ভুলভাঙ্গা	২০। বিদ্রোহ-শিখা

আপনার গৃহ-লাইব্রেরী মূতন, মনোজ্ঞ চিন্তাকর্মক

উপন্যাসসমাজে সুসজ্জিত করুন!

প্রত্যেকখানি ১০ আনা মাত্র

১। আলান কোয়াটারমেন	১০। সোনার শাণা
২। বরের নীলাম	১১। আশীর্বাদ
৩। রহস্যময়ী	১২। মহা, প্রাণপ্রমোদ
৪। বিভীষিকা	১৩। অরূপা
৫। নরকের পাথে	১৪। কব কে ?
৬। যোগী গৃহী	১৫। শিবানী
৭। মিলন-রাত্রি	১৬। চরকা-রাণী
৮। সীতার ভাগ্য	১৭। নার. গু. পদ্ম
৯। আনন্দময়ী	১৮। শুভক্ষণ

১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের পুস্তকের তালিকা

প্রত্যেকখানি ৥০ আনা মাত্র

১৯। সুখতারা	৪৩। লক্ষ্যপথে
২০। ভবানীপ্রদাদ	৪৪। নির্বাসিতা
২১। শাস্তিলতা	৪৫। বালজ্যাক
২২। দরিয়া	৪৬। গুলকাসেম
২৩। ভক্তিমতী	৪৭। জেলখানা
২৪। নারীধর্ম	৪৮। শিবরাত্রি
২৫। অভিশপ্ত দিবস	৪৯। দেশের মেয়ে
২৬। কল্যাণময়ী	৫০। নন্দন পাহাড়
২৭। স্মৃতিচিহ্ন	৫১। মদনপিয়াদা
২৮। কুলুইচণ্ডী	৫২। সম্পত্তিরক্ষা
২৯। অনিমম্বিতা	৫৩। হেমপ্রভা
৩০। ঋণের দায়	৫৪। ব্যাধিতা
৩১। সতীসাক্ষী	৫৫। পাপিষ্ঠা
৩২। প্লাবন	৫৬। গলগ্রহ
৩৩। পতিব্রতা	৫৭। বিজোহী
৩৪। হিন্দুগৃহ	৫৮। ঘটনার স্রোত
৩৫। চন্দ্রার বিপদ	৫৯। রসাল
৩৬। সই-মা	৬০। চিত্র
৩৭। চক্রীর চক্র	৬১। হৃদয়-শ্মশান
৩৮। অগ্নিমা	৬২। ডিউক তারার্টাদ
৩৯। সেবিন	৬৩। পরের মেয়ে
৪০। হীরক-বিভাট	৬৪। বিধবা
৪১। জীবন-রহস্য	৬৫। চাক্রবাল
৪২। অরুণা	৬৬। উমার নিয়তি

১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা

